প্রিয়নবী (সাঃ) এর জীবন-চরিত ও চারিত্রিক গুনাবলি সম্বলিত সুহিত-সারসংক্ষেপগ্রন্থ

সঙ্কলক : রবের ক্ষমার কাঙ্গাল হায়ছাম বিন মুহাম্মাদ জামিল সারহান।

প্রাক্তন শিক্ষক : (মসজিদে নববীস্থ হারাম ইনিস্টিটিউট)
তত্ত্বাবধায়ক : আত-তা'সীল আল-ইলমী ওয়েবসাইট।

আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত লেখক, লেখকের পিতা মহোদয় ও এ-ই পুস্তিকা প্রকাশনায় পৃষ্ঠপোষকতাকারী সকলের উপর ক্ষমার বারিধারা বর্ষণ করুক। আমিন!

মূল গ্রন্থের উপক্রমণিকা

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, কেউ তাকে বিপথগামী করতে পারে না এবং তিনি যাকে বিপথগামী করেন, কেউ তাকে হিদায়াত দান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শারীক নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল।

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।
হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্ঞা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।
হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।
তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।

অতঃপর, যে ব্যক্তির অন্তঃকরণে নবী (সা:), তাঁর জীবনবৃত্তান্ত ও পথনির্দেশনা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত হওয়ার ন্যুনতম অভিপ্রায় বদ্ধমূল, সে এ-ই সামান্য লিখনি অবগত হওয়া থেকে কখনো অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। ইবনুল কায়্যিম (রহ:) বলেছেন : উভয় জগতে বান্দার সুখ-সমৃদ্ধি যখন নবী (সা:) এর জীবনাদর্শের উপর নির্ভরশীল, ঠিক তখনি যে ব্যক্তি স্বীয়াত্মার হিতোপদেষ্টা, নাজাত ও সুখ-সমৃদ্ধকামী, তাঁর উপর নবী করিম (সাঃ) এর জীবনাদর্শ, জীবন-চরিত ও তাঁর শান-মর্যাদা সমন্ধে জানা অপরিহার্য। যা জানার মাধ্যমে সে মুর্খদের কাতার থেকে বের হয়ে তাঁর অনুসারীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ ও তাঁর সংগঠনের কাতারে গণনাভুক্ত হবে। সাধারণতঃ মানুষেরা নবী (সাঃ) কে জানার ক্ষেত্রে তিন শ্রেনীর হয়ে থাকে :-

১। মুস্তাক্বিল (যথেষ্ট পরিমাণ জানার মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি)
২। মুস্তাকসির (অধিক জানার ইচ্ছুক ব্যক্তি)
৩। মাহরুম (একেবারে না জেনে বঞ্চিত ব্যক্তি)

আর অনুগ্রহ আল্লাহর হাতেই রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই তা দান করেন। আর আল্লাহ তো মহান অনুগ্রহের অধিকারী। আমি কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে এ-ই কামনা করি, তিনি যেন আমাকে এবং তোমাদিগকেও তাঁর নাবীর প্রেম-ভালোবাসা, তাঁর নির্দেশনার আনুগত্য এবং পরিহার্য ও বারিত বিষয়গুলো পরিহার করার শক্তি প্রদান করেন।
“হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম (‘আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর (সাঃ) বংশধরদের উপর তেমনি বরকত দান করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম (‘আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের উপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী। আর প্রশংসা কেবলমাত্র বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাসুল (সাঃ) এর মহৎ গুনাবলি ও নীতিমালা।

বংশ পরিচয়

তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (শায়বাহ) বিন হাশিম (‘আমর) বিন আবদে মানাফ (মুগীরাহ) বিন কুসাই (যায়দ) বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কা‘ব লুওয়াই বিন গালিব বিন ফিহর (তাঁর উপাধি ছিল কুরাইশ এবং এ সূত্রেই কুরাইশ বংশের উদ্ভব) বিন মালিক বিন নাযর (ক্বায়স) বিন কিনানাহ বিন খুযায়মাহ বিন মুদরিকাহ (আমির) বিন ইলিয়াস বিন মুযার বিন নিযার বিন মা’আদ্দ বিন আদনান। আর আদনান হচ্ছেন (আল্লাহর কোরবানকৃত নবী) উপাধিতে বিভুষিত ইসমাঈল বিন (আল্লাহর সুহৃদ বন্ধু) উপাধিতে বিভুষিত ইবরাহীম আলাইহিমাস সালাম এর বংশধর।আর সম্যক্রূপে তিনিই ছিলেন ধরিত্রীবাসীসের মধ্যে কৌলিন্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। হাদীসে বর্ণিত আবু সুফয়ানকে উদ্দেশ্য করে হিরাকলিয়াস এর ভাষ্য : **আমি তার নিকট তাঁর (রাসূলের) বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাস করেছি। তুমি তার জবাবে উল্লেখ করেছ যে, তিনি (রাসূল সাঃ) তোমাদের মধ্যে সম্ভান্ত্র বংশের। প্রকৃতপক্ষে রাসূলগণকে তার কাওমের উচ্চ বংশে পাঠানো হয়ে থাকে।**

মনোনয়ন

রাসূল (সা:) বলেন : **মহান আল্লাহ ইসমা’ঈল (‘আঃ)-এর সন্তানদের থেকে ‘কিনানাহ্’-কে চয়ন করে নিয়েছেন, আর কিনানাহ্ (’র বংশ) হতে, ‘কুরায়শ’-কে বাছাই করে নিয়েছেন আর কুরায়শ (বংশ) হতে বানূ হাশিমকে বাছাই করে নিয়েছেন এবং বানূ হাশিম হতে আমাকে বাছাই করে নিয়েছেন।**

নামসমূহ

নবী (সাঃ) এর প্রত্যেকটি নামই গুনবাচক নাম। আবার শুধু এমন নামবাচক বিশেষ্য নয়, যা তাঁর স্রেফ পরিচায়ক। বরং তাঁর নামসমূহ এমন সব অমোঘ গুনাবলি থেকে নিষ্পন্ন যা তাঁর সংকীর্তন ও অনুপম পূর্ণত্বের জোরালো দাবী রাখে।

১। মুহাম্মাদ : রাসূল (সা:) এর সর্বাধিক সুবিদিত নামসমূহের অন্যতম একটি নাম। যদ্বারা তাঁকে তাওরাত নামক আসমানী গ্রন্থে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থ : অতিশয় প্রশংসার্হ নানাবিধ স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারী।

নামসমূহ

২। আহমাদ : অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর নিকট অধিকতর শ্লাঘনীয়। তাঁর অত্যাধিক প্রশংসিত স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের কারণে আসমান-জমীন ও ইহকাল-পরকালবাসী সকলেই তাঁর ভূয়সী প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একই নামে (মাসীহ) ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা নামকরণ করেছিলেন।
৩। ভরসাকারী : দীন প্রতিষ্ঠায় তিঁনি আল্লাহর উপর অন্য কারো সাথে শিরক স্থাপন না করতঃ অবিমিশ্রতভাবে অটল ভরসা রাখায় উক্ত নামে অভিহিত হয়েছেন।
৪। নিশ্চিহ্নকারী : যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা কুফরি নিশ্চিহ্ন করেন।
৫। সমাবেতকারী : যার পদধুলিতে মানবজাতিকে একত্রিত করা হবে। যেন তিনি পুরো মানবমণ্ডলীকে একত্রিত করার জন্য প্রেরিত।
৬। পরাগত : যার পর আর কোন নবী আসবে না। তিনিই সর্বশেষ নাবীর পদমর্যাদায় অভিষিক্ত।
৭। পশ্চাদ্গামী : তাঁর অগ্রবর্তী সকল নবীর পশ্চাদ্গামী। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলগনের সাথে অন্তমিলযুক্ত করেছেন।
৮। তওবার নবী : আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে ধরিত্রীবাসীদের উপর তওবার দ্বার উন্মোচিত করেছেন। তদনুপাতে তিঁনি তাদের তওবা পূর্বতন জাতিদের তুলনায় নজিরবিহীনভাবে কবুল করেছেন। নবী (সা:) সর্বাধিক ক্ষমা প্রার্থনাকারী ও তওবাকারী ছিলেন।
৯। যুদ্ধ-ময়দানে লড়াকু সিপাহসালার : যিনি আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। অন্য কোন নবী কিংবা তাঁর স্বজাতি মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মাতের জিহাদের ন্যায় আদৌ জিহাদ করেনি। এবং নবী (সাঃ) এর যুগে ঘটিত বড় বড় যুদ্ধ-সংঘর্ষের সাথে তৎপূর্বে কেউ পরিচিত ছিলেন না।
১০। করুনার নবী : মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে বিশ্ববাসীর জন্য অনুকম্পাস্বরুপ এ ধরণীতে প্রেরন করেছেন। যদ্দ্বারা তিনি পুরো জমীনবাসীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। আর মুমিনগণ তারা তো অনুগ্রহের বিরাট অংশ লুফে নিয়েছেন। এদিকে কাফেররা তাদের মধ্যে কিতাবধারীরা তাঁর রহমতের ছায়াতলে আশ্রিত থেকে জীবনযাপন করেছে। ও অনুগৃহীত হয়েছে, তাঁর রহমতের বাধনে ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে।
১১। সূচনাকারী : আল্লাহ তায়ালা আলোড়িত হেদায়াতের দ্বারকে তাঁর দ্বারা করেছেন অবারিত। এবং দৃষ্টিহীন নয়ন, বধির কর্ণ ও অর্ধাবৃত হৃদয়গুলোর তালাও খুলে দিয়েছেন। তাঁরই মাধ্যমে কাফেরদের অসংখ্য ভুখন্ডের বিজয় এনে দিয়েছেন। জান্নাতের প্রবেশদ্বারগুলো খুলে দিয়েছেন। উম্মুক্ত করেছেন সুহিত জ্ঞান-গরিমা ও নেক আমলের পদ্ধতিসমূহের তোরণ।
১২। আমানতদার : রাসূল (সাঃ) এই নামে আখ্যায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে সারা বিশ্ববাসীদের মধ্যে অধিক যোগ্যতর। তিঁনি ঐশীবানী ও দ্বীনের (ইসলামের) আল্লাহর একজন বিশ্বস্ত নবী। আসমান ও জমিনবাসী সকলের অনুপম আমানতদারসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। উপরন্তু রাসূল হিসেবে আগমনের পূর্বে কুরাইশরা তাঁকে তাঁর আমানতদারীতার জন্য আল-আমীন অভিধায় আখ্যা দিয়েছিলেন।

নামসমূহ

১০। করুনার নবী : মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে বিশ্ববাসীর জন্য অনুকম্পাস্বরুপ এ ধরণীতে প্রেরন করেছেন। যদ্দ্বারা তিনি পুরো জমীনবাসীর প্রতি অনুগ্রহ করেন। আর মুমিনগণ তারা তো অনুগ্রহের বিরাট অংশ লুফে নিয়েছেন। এদিকে কাফেররা তাদের মধ্যে কিতাবধারীরা তাঁর রহমতের ছায়াতলে আশ্রিত থেকে জীবনযাপন করেছে। ও অনুগৃহীত হয়েছে, তাঁর রহমতের বাধনে ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিতে।

১১। সূচনাকারী : আল্লাহ তায়ালা আলোড়িত হেদায়াতের দ্বারকে তাঁর দ্বারা করেছেন অবারিত। এবং দৃষ্টিহীন নয়ন, বধির কর্ণ ও অর্ধাবৃত হৃদয়গুলোর তালাও খুলে দিয়েছেন। তাঁরই মাধ্যমে কাফেরদের অসংখ্য ভুখন্ডের বিজয় এনে দিয়েছেন। জান্নাতের প্রবেশদ্বারগুলো খুলে দিয়েছেন। উন্মুক্ত করেছেন সুহিত জ্ঞান-গরিমা ও নেক আমলের পদ্ধতিসমূহের তোরণ।

১২। আমানতদার : রাসূল (সাঃ) এই নামে আখ্যায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে সারা বিশ্ববাসীদের মধ্যে অধিক যোগ্যতর। তিঁনি ঐশীবানী ও দ্বীনের (ইসলামের) আল্লাহর একজন বিশ্বস্ত নবী। আসমান ও জমিনবাসী সকলের অনুপম আমানতদারসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। উপরন্তু রাসূল হিসেবে আগমনের পূর্বে কুরাইশরা তাঁকে তাঁর আমানতদারীতার জন্য আল-আমীন অভিধায় আখ্যা দিয়েছিলেন।

১৩। সুসংবাদদাতা : আনুগত্যকারীর জন্য প্রতিদানের সুসংবাদদাতা এবং বিদ্রোহীর জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ভীতিপ্রদর্শনকর্তা।

১৪। আদম-সন্তানদের নেতা : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ক্বিয়ামাতের দিন আমি আদম-সন্তানদের ইমাম (নেতা) হব, এতে অহংকার নেই।

১৫। দীপ্তময় প্রদীপ : যিনি প্রজ্বালন ছাড়া দ্যুতি বিচ্ছুরণ করেন। এর বিপরীত হচ্ছে, উজ্জ্বল প্রদীপ কেননা তাতে একপ্রকার প্রজ্বালন রয়েছে।

আর তিঁনি হচ্ছেন আল্লাহর একজন অবিমিশ্রিত বান্দা। তাঁর সত্তার মাঝে দাসত্বের উপাদানসমূহ বিশেষ থেকে বিশেষোতর অনন্যতা ফুটে উঠেছিল। কেননা তিনি দাসত্বের সমস্ত স্তর পেরিয়ে পূর্ণাঙ্গ বান্দায় রুপান্তরিত হয়েছিলেন।

সামগ্রিকভাবে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সংক্ষিপ্ত গুনাবলি।

রাসূল (সাঃ) এর পূর্ণাঙ্গ গুনাবলির বর্ণনা যা তিঁনি স্বয়ং নিজেকে বিশেষিত করেছেন। যেমনভাবে তিনি বলেছেন : **আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি পছন্দ করি না যে, আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে মর্যাদার স্থানে রেখেছেন, তা অপেক্ষা তোমরা আমাকে অত্যুচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করবে।**

রাসূল (সা:) সর্বোত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন : **আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। আয়েশা (রা:) বলেন : কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র**। কুরআনের আমল জীবনে বাস্তবায়ন করতেন এবং এর বিধিমালা অবগত হতেন। এবং কারো প্রতি তাঁর সন্তুষ্ট ও বীতশ্রদ্ধ হওয়ার মানদণ্ড ছিল কুরআন।

আল্লাহর সুহৃদ বন্ধু : মহান আল্লাহ ইব্রাহীমকে যেমন খলীল বা একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সে রকমভাবে আমাকেও খলীল বা একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

রাসূল (সাঃ) এর শারীরিক সৌন্দর্যের বিবরণী ঃ

দৈহিক গঠন : আনাস বিন মালেক(রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণের। অর্থাৎ : (শ্বেতকায় গোলাকৃতির ন্যায়) তাঁর ঘাম যেন মুক্তার মতো। তিনি চলার সময় সম্মুখ পানে ঝুঁকে চলতেন। আমি নরম কাপড় (অর্থাৎ : একপ্রকার রেশমি কাপড়) বা রেশমকেও তাঁর হাতের তালুর মতো নরম পাইনি এবং মিশ্‌ক ও আম্বারের মাঝেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর শরীরের চেয়ে অধিক সুগন্ধ পাইনি।

দৈহিক অবকাঠামো : বারাহ বিন আযিব (রা:) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওযা সাল্লাম) মাঝারি গড়নের ছিলেন। অর্থাৎ : মাঝারি গঠন আকৃতিসম্পন্ন। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড় চাদর পরা অবস্থায দেখেছি। তাঁর চেয়ে বেশি সুন্দর আমি কখনো কাউকে দেখিনি।

মুখমণ্ডল : কা'ব ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওযা সাল্লাম) -কে সালাম করলাম, খুশী ও আনন্দে তাঁর চেহারা ঝলমল করে উঠলো। তাঁর চেহারা এমনিই আনন্দে টগবগ করত। মনে হত যেন চাঁদের একটি টুক্রা। তাঁর মুখমণ্ডলের এ অবস্থা হতে আমরা তা বুঝতে পারতাম। বারাআ (রহঃ) -কে জিজ্ঞেস করা হল, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওযা সাল্লাম) -এর চেহারা মুবারক কি তলোযারের মত ছিল? তিনি বললেন, না বরং চাঁদের ন্যায় ছিল।

কেশগুচ্ছ : আনাস বিন মালেক বলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর হাত গোশ্‌তে পূর্ণ ছিল। তাঁর পরে আমি কোন লোককে এমন দেখিনি। আর নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর চুল ছিল মাঝারি রকমের, অধিক কোঁকড়ানোও না, (অর্থাৎ : তাতে মোচড়ানো ও কোচকে ছিল না।) অধিক সোজাও না। (অর্থাৎ : ঝুলন্ত ছিল না।)

আঁখিদ্বয় : জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাঃ) বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মুখ ছিল বেশ দীর্ঘ, (অর্থাৎ : প্রশস্ত।) চোখ দু'টি ছিল লাল অর্থাৎ : চোখদ্বয়েরর শুভ্রাংশে রক্তিমতা ছিল। এবং পায়ের জঙ্ঘা ছিল শীর্ণকায়। (অর্থাৎ : সামান্য মাংসবিশিষ্ট গোড়ালি।)

ঘর্ম : আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের গৃহে আসলেন এবং আরাম করলেন। (অর্থাৎ : দ্বিপ্রাহরিক সামান্য বিশ্রাম নিলেন।) তিনি ঘর্মাক্ত হলেন, আর আমার মা একটি ছোট বোতল নিয়ে মুছে তাতে ভরতে লাগলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জাগ্রত হলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, হে উম্মু সুলায়ম একি করছ? আমার মা বললেন, এ হচ্ছে আপনার ঘাম, যা আমরা সুগন্ধির সাথে মেশাই, আর এ তো সব সুগন্ধির সেরা সুগন্ধি।

মোহরে নবুয়ত : তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে মোহরে নবুয়ত ছিল। যা তাঁর কায়ায় তিলকের ন্যায় স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান ছিল। জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর দু'কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে মোহরে নবুওযাত দেখেছি। আর তা যেন কবুতরের ডিম সদৃশ। যা তাঁর গাত্রবর্ণ-সদৃশ ছিল।

রাসূল (সাঃ) এর চারিত্রিক গুনাবলিঃ

রাসূলের শানে সাহাবাগণের সম্মান প্রদর্শন : আমর বিন আস বলেন : আমার অন্তরে রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপেক্ষা বেশি প্রিয় আর কেউ ছিল না। আমার চোখে তিনি অপেক্ষা মহান আর কেউ নেই। অপরিসীম শ্রদ্ধার কারণে আমি তাঁর প্রতি চোখভরে তাকাতেও পারতাম না। আজ যদি আমাকে তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা করতে বলা হয় তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। কারণ চোখ ভরে আমি কখনই তাঁর প্রতি তাকাতে পারিনি।

উরয়া বিন মাসউদ আস-সাক্বাফী হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে কুরাইশদের নিকট রাসূল (সাঃ) কে সাহাবীগণের সম্মান প্রদর্শনীর ব্যাপারে বলতে গিয়ে বললেন : আল্লাহর কসম করে বলতে পারি যে, কোন রাজা বাদশাহকেই তাঁর (রাসূলের) অনুসারীদের মত এত সম্মান করতে দেখিনি, যেমন মুহাম্মাদের অনুসারীরা তাঁকে করে থাকে। আল্লাহর কসম আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যদি থুথু ফেলেন, তখন তা কোন সাহাবীর হাতে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা তা তাদের গায়ে মুখে মেখে ফেলেন। তিনি কোন আদেশ দিলে তারা তা সঙ্গে সঙ্গে পালন করেন; তিনি ওযু

করলে তাঁর ওযুর পানি নিয়ে সাহাবীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়; তিনি কথা বললে, সাহাবীগণ নিশ্চুপ হয়ে শুনেন। এমনকি তাঁর সম্মানার্থে তারা তাঁর চেহারার দিকেও তাকান না।

আল্লাহ সাথে শিষ্টাচারিতা : আব্দুল্লাহ বিন শিখখির বলেন, একদা আমরা বললাম, আপনি আমাদেও অবিসংবাদিত নেতা। তিনি বললেন, প্রকৃত নেতা হলেন বরকতময় মহিয়ান আল্লাহ। আমরা বললাম, আপনি মর্যাদার দিক হতে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং দানের বিশালতায় আপনি মহান। তিনি বললেন, তোমাদের এ কথা তোমরা বলতে পারো, অথবা তোমাদের এরূপ কিছু বলায় কোন সমস্যা নেই। তবে শয়তান যেন তোমাদেরকে তার প্রতিনিধি না বানায়।

অমিত বীর-বিক্রমতা : আলী (রা:) বলেন : যে সময় যুদ্ধের আগুন জলে উঠে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হতো, সে সময় আমরা রাসূল (সাঃ) এর আড়াল গ্রহন করতাম। কেউ তাঁর চেয়ে বেশী শত্রুর কাছাকাছি হতো না।

তাক্বওয়া : রাসূল (সা:) বলেছেন : শোনো আল্লাহর কসম আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তাঁর ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি।

পত্নীদের প্রতি সদাচারী : নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের চেয়ে আমার পরিবারের কাছে অধিক উত্তম।

লজ্জাশীলতা : আয়েশা (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পর্দানশীল কুমারী মহিলার চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। আর যখন তিনি কোন জিনিসকে অপছন্দ করতেন আমরা তাঁর মুখাবয়ব হতে তা বুঝতে পারতাম।

সৌকর্যতা : আয়েশা (রাঃ) বলেন , নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কে যখনই (আল্লাহ্‌র নিকট থেকে) দু'টো কাজের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হত, তখন তিনি দু'টোর সহজটি বেছে নিতেন, যতক্ষণ না সেটা গুনাহ্‌র কাজ হত। যদি সেটা গুনাহ্‌র কাজ হত তাহলে তিনি তাথেকে বহু দূরে থাকতেন।

স্বপ্রতিশোধ অগ্রহণকারী : আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- কখনও তাঁর ব্যক্তিগত কারণে কোন কিছুর প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র হারামসমূহকে ছিন্ন করা হত। সেক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র জন্য তিনি প্রতিশোধ নিতেন।

খাদ্যদ্রব্যের অনিন্দুক : আয়েশা (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন সময় কোন খাদ্যকে মন্দ বলেননি। কোন খাদ্য প্রিয় হলে খেয়েছেন আর পছন্দ না হলে ছেড়ে দিয়েছেন।

উপঢৌকন গ্রহনকারী : আয়েশা (রাঃ) বলেন : রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন।

দান-দক্ষিণা অভক্ষণকারী : রাসূল (সা:) বলেছেন : তুমি কি জান না যে, মুহাম্মাদের বংশধর (বনূ হাশিম) সদকা ভক্ষণ করে না।

বিনয়াবনতা : উক্বা বিন আমের (রাঃ) বলেন : এক ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এল। তিনি লোকটির সাথে কথা বলেন। তার কাঁধের গোশ্ত (ভয়ে) কাঁপছিল। তিনি তাকে বলেনঃ তুমি শান্ত হও, স্বাভাবিক হও। কারন আমি কোন রাজা-বাদশা নই, বরং আমি শুকনো গোশ্ত খেয়ে জীবনধারিনী এক মহিলার পুত্র।

পত্নী-সেবা : আসওয়াদ বিন ইয়াযিদ (রাঃ) বলেন, আমি ‘আয়িশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি বললেন, ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ স্ত্রীদের সহায়তা করতেন। আর সালাতের সময় হলে সালাতের জন্য চলে যেতেন।

জাহেল-মূর্খদের ব্যাপারে অমনোযোগী : রাসূল (সা:) বলেছেন : তোমরা কি আশ্চর্যান্বিত হও না? আমার উপর আরোপিত কুরাইশদের নিন্দা ও অভিশাপকে আল্লাহ্ তা’আলা কি চমৎকারভাবে দূরীভূত করছেন? তারা আমাকে নিন্দিত ভেবে গালি দিচ্ছে, অভিশাপ করছে অথচ আমি মুহাম্মাদ চির প্রশংসিত।

সত্যবাদিতা : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা:) বলেন : সত্যবাদী-সত্যনিষ্ঠ হিসাবে স্বীকৃত রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সেবকের সাথে চারিত্রিক আচরণ : আনাস (রা:) বলেন : আমি দশ বছর রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমাত করেছি। আল্লাহর শপথ তিনি কখনো আমাকে ‘উহ্’ শব্দও বলেননি এবং কোন সময় আমাকে ‘এটা কেন করলে’, ‘ওটা কেন করনি’ তাও বলেননি।

সাহাবীদের থেকে কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য গ্রহণকারী নন এবং সুবিশাল ও উদারচিত্তের অধিকারী : আনাস বিন মালেক (রা:) বলেন : একদা আমরা মসজিদে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন জনৈক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় প্রবেশ করল। মসজিদে (প্রাঙ্গণে) সে তার উটটি বসিয়ে (বেঁধে) দিল। অতঃপর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলল, ‘তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন ব্যক্তি?’ আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন তাদের সামনেই হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা বললাম, ‘এই হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ফর্সা ব্যক্তিটিই হলেন তিনি।’অতঃপর লোকটি তাঁকে লক্ষ্য করে বলল, ‘হে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র’ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেনঃ ‘আমি তোমার উত্তর দিচ্ছি? লোকটি বলল, ‘আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব এবং সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে কঠোর হব, এতে আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না।’ ‘তিনি বললেন, ‘তোমার যা মনে চায় জিজ্ঞেস কর।’সে বলল, ‘আমি আপনাকে স্বীয় প্রতিপালক এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতিপালকের শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহ কি আপনাকে সমগ্র মানবকুলের প্রতি রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন?’ তিনি বললেনঃ ‘আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের আদেশ দিয়েছেন?’ তিনি বললেনঃ ‘আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রমযান) সিয়াম পালনের আদেশ দিয়েছেন?’ তিনি বললেনঃ ‘আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ সে বলল, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি, আল্লাহই কি আপনাকে আদেশ দিয়েছেন, আমাদের ধনীদের থেকে এসব সদাক্বাহ (যাকাত) আদায় করে দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করে দিতে?’ নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ ‘আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ।’ অতঃপর লোকটি বলল, ‘আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আপনি যা (যে শরী‘য়াত) এনেছেন তার উপর। আর আমি আমার গোত্রের রেখে আসা লোকজনের পক্ষে প্রতিনিধি, আমার নাম যিমাম ইব্‌নু সা‘লাবা, বানী সা‘আদ ইব্‌নু বক্‌র গোত্রের একজন।

জীবিকা নির্বাহী রূটি : আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর ওফাত পর্যন্ত মুহাম্মাদ (সঃ) এর পরিবারবর্গ একাধারে দুদিন পেট ভরে যবের রুটি আহার করেননি।

দুনিয়া-বিমুখী : নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- বললেন আমার নিকট এ উহুদ পরিমান স্বর্ণ হোক, আর তা ঋণ পরিশোধ করার জন্য রেখে দেয়া ছাড়া একটি দীনারও তা থেকে আমার কাছে জমা থাকুক আর এ অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হোক তা আমাকে আনন্দ দিবে না। বরং আমি তা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে এভাবে এভাবে এভাবে বিলিয়ে দেব।

সুশীলভাষী : আয়েশা (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো অশ্লীল ও কটুভাষী ছিলেন না, অশ্লীল ব্যবহারও করেননি। তিনি কখনো বাজারে গিয়ে হট্টগোল করতেন না এবং অন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিশোধ নেননি। বরং তিনি উদার মন নিয়ে ক্ষমা করে দিতেন।

কোন অপরিচিতার হাতের তালু স্পর্শ করতেন না : আয়েশা (রা:) বলেন :রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তালু কোন দিন কোন (অপরিচিতা) মহিলার তালুর স্পর্শ লাগেনি।

বাসস্থান ও জীবনযাত্রা : উমার (রাঃ) বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে প্রবেশ করলাম। সে সময় তিনি খেজুর পত্র নির্মিত একটি চাটাইয়ের উপর কাত হয়ে শোয়া ছিলেন। আমি সেখানে বসে পড়লাম। তিনি তাঁর চাদরখানি তাঁর শরীরের উপরে টেনে দিলেন। তখন এটি ছাড়া তাঁর পরনে অন্য কোন কাপড় ছিল না আর বাহুতে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। এরপর আমি স্বচক্ষে রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সামানাদির দিকে তাকালাম। আমি সেখানে একটি পাত্রে এক সা’ (আড়াই কেজি পরিমাণ) এর কাছাকাছি কয়েক মুঠো যব দেখতে পেলাম। অনুরূপ বাবলা জাতীয় গাছের কিছু পাতা (যা দিয়ে চামড়ায় রং করা হয়।) কামরার এক কোণায় পড়ে আছে দেখলাম। আরও দেখতে পেলাম ঝুলন্ত একখানি চামড়া যা পাকানো ছিল না। তখন তিনি বলেন, এই সব দেখে আমার দু’ চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হে খাত্তাবের পূত্র কিসে তোমার কান্না পেয়েছে? আমি বললাম, হে আল্লাহর নাবী কেন আমি কাঁদব না। এই যে চাটাই আপনার শরীরের পার্শ্বদেশে দাগ বসিয়ে দিয়েছে। আর এই হচ্ছে আপনার কোষাগার। এখানে সামান্য কিছু যা দেখলাম তা ছাড়া তো আর কিছুই নেই। পক্ষান্তরে ঐ যে রোমক বাদশাহ ও পারস্য সম্রাট, কত বিলাস ব্যসনে ফলমূল ও ঝরণায় পরিবেষ্টিত হয়ে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করছে। আর আপনি হলেন আল্লাহর রসূল এবং তাঁর মনোনীত ব্যক্তি। আর আপনার কোষাগার হচ্ছে এই তখন তিনি বললেন, হে খাত্তাব তনয় তুমি কি এতে পরিতৃষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখিরাত আর তাদের জন্য দুনিয়া (পার্থিব ভোগ বিলাস)। আমি বললাম, নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট।

প্রশ্ন	সত্য / মিথ্যা
১। উভয়ব্রক্ষাণ্ডের বান্দার সুখ-সমৃদ্ধি নবী (সা:) এর জীবনাদর্শের উপর নির্ভরশীল?	ঃ☐ / ☐
২। রাসূলগণ সম্ভ্রান্ত বংশে প্রেরিত হন?	ঃ☐ / ☐
৩। রাসূল (সাঃ) এর পূর্ণাঙ্গ গুনাবলির বর্ণনা যা তিঁনি স্বয়ং নিজেকে বিশেষিত করেছেন। যেমনভাবে তিনি বলেছেন : আমি মুহাম্মাদ (সা:) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল?	ঃ☐ / ☐
৪। নরম কাপড় কিংবা রেশমির কাপড় নবী (সাঃ) এর হাতের তালু অপেক্ষা মোলায়েম?	ঃ☐ / ☐
৫। আল্লাহ তাঁর নাবীর (সাঃ) মাঝে চারিত্রিক গুনাবলির পূর্ণতা ও সুষমামণ্ডিত মেজাজের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। এবং তাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, অনুগ্রহ, এবং দুনিয়া ও আখিরাতী জীবনে যার মাঝে মুক্তি, বিরাট সফলতা ও সুখ-সমৃদ্ধি রয়েছে তাও প্রদান করেছেন। এবং আরো অনেক কিছু দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেন নি।?	ঃ☐ / ☐
৬। নবী (সা:) নিরক্ষর ছিলেন, পড়তে ও লেখতে জানতেন না। কোন মর্ত্যলোক তাঁর শিক্ষক ছিল না?	ঃ☐ / ☐

৭। সম্যক্রূপে, কে ছিলেন ধরিত্রীবাসীসের মধ্যে বংশ-আভিজাত্যের দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব? ইউনুস বিন মাত্তা ☐ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ ☐

৮। নবী (সা:) এর নামসমূহ : ১। নবী (সাঃ) এর প্রত্যেকটি নামই গুনবাচক নাম ☐ ২। আবার শুধু এমন নামবাচক বিশেষ্য নয়, যা তাঁর স্রেফ পরিচায়ক ☐ ৩। নামগুলো এমন সব অমোঘ গুনাবলি থেকে উৎপন্ন যা তাঁর প্রশংসা ও অনুপম পূর্ণত্বের জোরালো দাবী রাখে ☐৪।প্রাগুক্ত সবকটি ☐ ৫।প্রথম ও তৃতীয়টি

৯। নবী (সাঃ) এর চরিত্রই ছিল কুরআন, এর ব্যাখ্যা ১। কুরআনিই ছিল তাঁর সন্তুষ্ট হওয়ার মানদণ্ড ☐ ২। কুরআনিই ছিল তাঁর বীতশ্রদ্ধ হওয়ার মানদণ্ড? ☐ ৩।প্রাগুক্ত উভয়টাই ☐

১০। আল্লাহুর একান্ত বন্ধু কে? ১। ইবরাহীম (আঃ) ☐ ২। মুহাম্মাদ (সাঃ) ☐ ৩। উভয়ই ☐

১১। রাসূল (সাঃ) ছিলেন শ্রভ্র উজ্জ্বল বর্ণের। এর ব্যাখ্যা কী? ১। গোধূমবর্ণ ☐ ২। শুভ্রজ্জ্বল ☐ ৩। অত্যম্ভ গৌরবর্ণের ☐

১২। সুগন্ধির সেরা সুগন্ধি কোনটি? ১। কুস্তরী সুগন্ধি ☐ ২। রাসূল (সাঃ) এর শরীর-ক্ষরিত স্বেদ ☐

১৩। রাসূল (সাঃ) এর দৈহিক গঠন মাঝারি গড়নের ছিল। এর ব্যাখ্যা কি? ১। মাঝারি গঠন আকৃতিসম্পন্ন ☐ ২। চওড়া গঠন আকৃতিসম্পন্ন ☐

১৪। মোহরে নবুয়ত? ১। উভয় কাধের মাঝখানে? ☐ ২। গাত্রবর্ণ-সদৃশ ☐ ৩। কবুতরের ডিম সদৃশ ৪।প্রাগুক্ত সবকটিই ☐

নশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা বাছাই করেছেন ঃ	কিনানা	বনু হাশেম	ইসমাঈল	কুরাইশ বংশ থেকে
১। কিনানাকে যে বংশধর থেকে বাছাই করেছেন ঃ	☐	☐	☐	☐
২। কুরাইশকে বাছাই করেছেন ঃ	☐	☐	☐	☐
৩। বনু হাশেমকে বাছাই করেছেন ঃ	☐	☐	☐	☐
৪। নবী (সাঃ) কে বাছাই করেছেন ঃ	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) এর বংশধারা ঃ	নবীর নাম,	পিতার নাম,	দাদার নাম,	দাদামহর নাম,	পূর্ব উপরিস্থিত দাদা,	উপরিস্থিত দাদা,
হাশেম ঃ	☐	☐	☐	☐	☐	☐
আ: মুত্তালিব ঃ	☐	☐	☐	☐	☐	☐
আব্দুল্লাহ ঃ	☐	☐	☐	☐	☐	☐
মুহাম্মাদ ঃ	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ইসমাইল ঃ	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ইবরাহীম ঃ	☐	☐	☐	☐	☐	☐

প্রতিটি বিশেষ্যকে তার পার্শ্ববর্তী উল্লিখিত যথোচিত বিশ্লেষণের সাথে সংযোগ স্থাপন করো।	মুহাম্মাদ	আহমাদ	পরাগত	প্রদ্বীপ
১। যিনি তাঁর রবের নিকট মানবজাতির মাঝে সর্বাধিক প্রশংসিত ঃ	☐	☐	☐	☐
২। প্রজ্বালন ছাড়াই আলোকদানকারী ঃ	☐	☐	☐	☐
৩। অতিশয় প্রশংসার্হ নানাবিধ স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারীঃ	☐	☐	☐	☐
৪। যিনার পর আর কোন নবী আসবে না, তিঁনি সর্বশেষ নবীর মর্যাদায় অভিষিক্ত ঃ	☐	☐	☐	☐

নবী (সাঃ) ছিলেন ঃ	হাতের তালু,	সৌরভের দিক দিয়ে,	সাধুসংসর্গতায়,	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও শারিরীক সৌন্দর্য,	পরহেজগার,
১। মানবন্ডলীর মাঝে অধিকতর সুষমাময়ী ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
২। অত্যাধিক নরম ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৩। অধিক সুবাসিত ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৪। সর্বাধিক উত্তম ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৫। দৃঢ়পদ ছিলেন ঃ	☐	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) :	মহান আল্লাহর জন্য,	খাদ্য-দ্রব্যকে,	নিজের জন্য,	দান-খয়রাত,	উপঢৌকন,
১। প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
২। প্রতিশোধ নিতেন ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৩। মন্দ বলতেন না ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৪। গ্রহণ করতঃ প্রতিদানের ব্যবস্থা করতেন ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৫। গ্রহণ করতেন না ঃ	☐	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) এর দিক-নির্দেশনাঃ

পোশাক-পরিচ্ছেদ, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়দ্রব্য সংশ্লিষ্ট

পছন্দের রঙ : সাদা ছিল রাসূল (সাঃ) এর প্রিয় রঙ। তিনি বলেছেন : **তোমাদের পোশাকের মধ্যে উত্তম পোশাক হল সাদা পোশাক। অতএব তোমরা সাদা রংয়ের পোশাক পরো এবং তা দিয়ে মৃতদের কাফন দাও।**

পরিধেয়-বস্ত্র : হাতের নাগালে যে কাপড় পেতেন তাই পরিধান করতেন। কখনো পশমের, সুতি আবার কখনো লিলেনের। তিনি যখন জামা পরতেন, তখন ডান দিক হতে পরা আরম্ভ করতেন।

মধ্যমমানের পোশাক পরিধান : সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ বলতেন : তাঁরা খুব উন্নতমানের আবার খুব নিম্মমানের জামা প্রসিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্য পরিধান করা অপছন্দ করতেন। ইবনু উমার (রাঃ) এর হাদীসে এসেছে **: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যশ লাভের উদ্দেশ্যে পোশাক পরে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন, অতঃপর তাতে অগ্নিসংযোগ করবেন।** কেননা সে দাম্ভিকতা ও বড়াই সহকারে কাপড় পরিধান করে থাকে। যার ফলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বদৌলতে সাজা প্রদান করবেন। তদ্রূপ ইবনু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন **: যে ব্যক্তি গর্বের সঙ্গে পরনের কাপড় টাখনুর নিম্নভাগে ঝুলিয়ে চলাফিরা করে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না।**

খাদ্যদ্রব্য : বিদ্যমান যে কোন খাবার, ফিরিয়ে দিতেন না। লিপ্সাযুক্ত অবিদ্যমান খাবারের জন্য কষ্ট পেতেন না। যে কোন পবিত্র আহার্য তাঁর সম্মুখে পরিবেশন করা হলে, তৎক্ষনাৎ তা আহার করে নিতেন। তবে খাবারের সাথে অভিরুচি না মিললে হারামের হুকুমদান ব্যতীত পরিহার করেছেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন **: সূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন সময় কোন খাদ্যকে মন্দ বলেননি। কোন খাদ্য প্রিয় হলে খেয়েছেন আর পছন্দ না হলে ছেড়ে দিয়েছেন।** যেরুপ গুইসাপ আহারে অনভ্যস্ত থাকায় তা পরিহার করেছেন।

আহারের ধরন ও পদ্ধতি : অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর খাবার মাটির উপর বিছানো দস্তরখানায় রাখা হতো। তিন আঙুল দিয়ে পানাহার করতেন। হেলানরত অবস্থায় খেতেন না। খাদ্য গ্রহণের প্রারম্ভে

বিসমিল্লাহ এবং শেষাংশে আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করতেন। খাবার শেষে আঙুলগুলো ভাল করে চেটে নিতেন।

পানীয় পান : অধিকাংশ সময় উপবেশিত অবস্থায় পান করতেন। পরন্তু দাড়িয়ে পান করা থেকে কঠোরভাবে বারণ করেছেন। বসে পান করার প্রতিবন্ধকতাস্বরুপ ওজর থাকলে দাঁড়িয়ে পান করা জায়েজ আছে। তিনি পান করার পর তাঁর ডান পাশের লোককে দিতেন। যদিও বাপ পাশের লোক ডান পাশের লোকের চেয়েও বয়সে বড় হত।

বিবাহ-শাধী ও সাধুসংসর্গতা ঃ

রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ **পার্থিব বস্তুর মধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধী আমার নিকট পছন্দনীয় করা হয়েছে এবং সলাতে রাখা হয়েছে আমার নয়নের প্রশান্তি।** তিনি পত্নীদের মাঝে নৈশযাপন, থাকার জায়গা ব্যবসস্থাকরণ ও ভরণপোষণের ব্যাপারে ভাগাভাগি করে নিতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন : **রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সফরের মনস্থ করলে স্ত্রীগণের মধ্যে কুর'আর ব্যবস্থা করতেন। যার নাম আসত তিনি তাঁকে নিয়েই সফরে বের হতেন। বাকীদের জন্য কিছুই নির্ধারণ করতেন না।** বিবিদের সঙ্গে তাঁর পুরো জীবন ছিল চমৎকার ঘনিষ্ঠতা ও মনোরঞ্জনী ব্যবহারে সমৃদ্ধ। তিঁনি আয়েশা (রা:) কে আনসার-রমণীদের কাছে ক্ষুদ্র পুতুল দ্বারা খেলা করার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তিনি যখন কোন কিছুর আবদার ধরতেন, তাতে কোন অসুবিধা না থাকলে আবদার রক্ষা করতেন। তিঁনি আয়েশা (রাঃ) এর কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কখনো তিনি হায়িয অবস্থায় থাকতেন। রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ঋতুবতী হলে শক্তভাবে ইযার পরিধানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি তার সাথে শয়ন বা মেলামেশা করতেন। রোযা রাখাবস্থায় তাঁকে চুম্বন করতেন। এবং তাঁর পেলবতা ও চারিত্রিক উন্নত বৈশিষ্টের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে, তাঁকে খেলা ও রসিকতা করার বন্দোবস্ত করে দিতেন। এবং সফরে থাকাকালীন সময়ে নবী (সাঃ) তার সাথে দুবার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা দুজন একবার একজনের পিছনে আরেকজন চলে গৃহ থেকে বের হয়ে ছিলেন। তিঁনি যখন সফর করে গৃহে ফিরতেন তখন রাত্রি বেলায় (অজ্ঞাতসারে) পরিবারের নিকট প্রবেশ করতেন না। এবং তিঁনি রাতের বেলা পরিবারের কাছে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন।

নিদ্রা ও জাগরণের দিক-নির্দেশনাঃ

নিদ্রার জন্য বিছানা গমনকালে এ-ই দুয়া পাঠ করতেন : হে আল্লাহ আমি আপনার নামেই মরি এবং জীবিত হই। এবং প্রতি রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিছানায় যাওয়ার প্রাক্কালে সূরা ইখ্‌লাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে দু'হাত একত্র করে হাতে ফুঁক দিয়ে যতদূর সম্ভব সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে আরম্ভ করে তাঁর দেহের সম্মুখ ভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার এরূপ করতেন।তিঁনি যখন শয়ন করতেন তখন তাঁর ডান হাত গালের নীচে রেখে তিনবার বলতেনঃ "আল্লাহুম্মা ক্বিনী 'আযাবাকা ইয়াওমা তাব'আসু ইবাদাকা" (অর্থঃ হে আল্লাহ আপনি যেদিন আপনার বান্দাদেরকে কবর হতে উঠাবেন, সেদিন আমাকে আপনার 'আযাব হতে রক্ষা করবেন)।তিঁনি যখন ঘুম হতে সজাগ হতেন তখন বলতেন, "আল্‌হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্‌ইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা- ওয়া ইলাইহিন্‌ নুশূর" অর্থাৎ- "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি আমাদেরকে মৃত্যুবরণের পর জীবিত করছেন। আর তার দিকেই প্রত্যাবর্তন।
অতঃপর তিঁনি মেসওয়াক করতেন। তিঁনি রাতের প্রথমাংশে শয্যা গ্রহণ করতেন এবং শেষাংশে ত্যাগ করতেন।
কখনো রাত্রির প্রথমাংশ মুসলমানদের মঙ্গলসাধনে মশগুল থেকে জাগ্রত থাকতেন। ঘুমুলে তাঁর চক্ষুদ্বয় ঘুমাতো, কিন্তু অন্তঃকরণ সজাগ থাকত।
তিঁনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে শয্যাত্যাগ না করা পর্যন্ত কেউ তাঁকে জাগ্রত করতেন না।
তিঁনি যাথাথ্র্য ও সবথেকে ফলোদপাদক ঘুম ঘুমাতেন

দৈনন্দিন মানুষের সাথে আচার-ব্যবহার ঃ

লোকদেরকে হাসানোর জন্য রসিকতা করতেন। রসিকতা করতে গিয়ে অসত্যের আশ্রয় নিতেন না।
কৃত্বিম ভান করতেন, কিন্তু মিথ্যা বলতেন না।
তিঁনি পরামর্শ দিতেন ও গ্রহনও করতেন।
রোগীদের সেবা-শুশ্রুষা করতেন।
মুসলমানদের জানাযায় উপস্থিত হতেন।
দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল করতেন।
পতিহীনা, অসহায়, ও স্থবিরদের প্রয়োজনের পাশে দাড়াতেন।
নিজ গুনগান কবির কাছে থেকে শ্রবণ করতেন এবং তার জন্য পুরুস্কারের ব্যবস্থা করতেন।
তাঁর ভূয়সী গুনগানের কিয়দংশই গাওয়া হতো। তিঁনি ব্যতীত অন্যদের ভূয়সী প্রশংসা অধিকাংশই অলীক ও অবাস্তব।

স্বহস্তে পায়ের জুতা মেরামত করেছেন। কাপড়ে তালিও লাগিয়েছেন। স্বহস্তে বালতি মেরামত করেছেন। বকরীর দুধ দোহন করেছেন। কাপড় প্রক্ষালন করেছেন। নিজ ও পরিবার-পরিজনের পরিচর্যা করেছেন। মাসজিদ বিনির্মানে সাহাবা কেরামের সাথে ইট বহন করেছেন।
কখনো জঠরজ্বালায় উদরে পাথর বেধেছেন। আবার কখনো পরিতৃপ্ত হয়েছেন।
নিমন্ত্রণ করেছেন, নিমন্ত্রিত হয়েছেন।
মাথার মধ্যভাগে, পায়ের পাতার পশ্চাদ্ভাগে, ঘাড়ের দুটি রগে এবং কাঁধে রক্তমোক্ষণ করেছেন।
চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন, অন্যকে আগুনের দ্বারা দাগ দিয়েছেন, নিজে দাগ দেননি। অন্যকে ঝাড়ফুঁক করেছেন, অন্যের কাছে থেকে ঝাড়ফুঁক গ্রহন করেননি। রোগীকে পীড়াদায়ক বস্তু থেকে সুরক্ষা দিয়েছেন।
তিঁনি সমগ্র মানবমণ্ডলির মাঝে ছিলেন সর্বোত্তম আচরণকারী। কোন কিছু ধার নিলে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছু দ্বারা ধার পরিশোধ করতেন।

চলনভঙ্গি ঃ

সকল মানুষের মাঝে তিঁনি ছিলেন সর্বাধিক ক্ষিপ্র, সেরা ও শান্তশিষ্ট পদব্রাজক।
তিঁনি সাহাবিদের অপেক্ষা দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুত পাদচারী ছিলেন। তাঁর সাথে পথ চলতে তাদের বেগ পেতে হত।
কখনো খালি পায়ে আবার কখনো জুতা পরে পদব্রজে গমন করতেন।
সাহাবীরা সামনে হাটতেন আর তিঁনি তাদের পিছনে হাটতেন।
তিঁনি সাহাবীদের সঙ্গে হাটার সময় একজন একজন করে কিংবা সজ্ঞবদ্ধ হয়ে হাটতেন।

আল্লাহর জিকির-আজকার ঃ

সমগ্র মানবমণ্ডলীর মাঝে তিনি ছিলেন একজন আল্লাহর পূর্ণ জিকিরকারী। তদুপরি, তিঁনি তাঁর সমুদয় কথা-বার্তার দ্বারা সদা-সর্বদা আল্লাহর জিকির-আজকার এবং তাঁকে খুশী করে এমন পূন্যকর্মে ব্রতী থাকতেন।
ঘুম থেকে জাগ্রত হলে, সলাত/নামাজ আদায়ের প্রাক্কালে, গৃহ প্রস্থানকালে, মাসজিদে প্রবেশকালে, সকাল-সন্ধ্যা, জামা পরিধানকালে, পৃহে প্রবেশ ও প্রস্থান সন্ধিক্ষণে, শৌচাগারে প্রবেশকালে, ওজুর আগে ও পরক্ষণে, আযান শ্রবণকালে, নবচন্দ্র দর্শনকালে, আহার পূর্বে-পরে এবং হাঁচি-কাশির সময়েও আল্লাহর জিকির করতেন।

স্বভাবগত রীতিনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ঃ

স্বভাবগত রীতিনীতি এর সংখ্যা : নাবী (সা:) বলেছেনঃ দশ প্রকার কাজ ফিত্‌রাতের (স্বভাব ধর্মের) অন্তর্গতঃ (১) গোঁফ কাটা, (২) দাড়ি লম্বা করা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) নাকে পানি দেয়া, (৫) নখ কাটা, (৬) আঙ্গুলের গ্রন্থিগুলো ধোয়া, (৭) বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা, (৮) নাভীর নিম্নাংশের চুল কামানো এবং (৯) পানি দ্বারা শৌচ করা। বর্ণনাকারী দশম কাজটি ভুলে গেছেন।

ডান দিক হতে আরম্ভ করা : নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুতা পরা, চুল আচঁড়ানো, পবিত্রতা অর্জন করা এবং আদান-প্রদান করা তথা প্রত্যেক কাজই ডান দিক হতে আরম্ভ করতে পছন্দ করতেন। খাদ্যদ্রব্য আহার, পানীয় পান ও পবিত্রতা অর্জনের জন্য ডান হাত এবং শৌচকর্ম ও ময়লা-আবর্জনা দূরীকরণে বাম হাত ব্যবহার করতেন।

মাথা মুণ্ডন করা : মাথা মুণ্ডনের ব্যাপারে তাঁর সুন্নাত হচ্ছে, হয় সবটুকু কামিয়ে ফেলা নতুবা সবটুকু রেখে দেওয়া।

মিসওয়াক করা : মিসওয়াক করা ছিল তাঁর প্রিয় কাজ। সিয়াম (রোযা) রাখা ও না রাখা উভয় অবস্থাতেই মিসওয়াক করতেন। ঘুম থেকে জাগ্রতকালে, ওজুর সময়, নামায আদায়ের প্রারম্ভে এবং গৃহে প্রবেশকালে মিসওয়াক করতেন। আরাক নামক গাছের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করতেন।

সুগন্ধি ব্যবহার : তিঁনি বেশি বেশি সুগন্ধি লাগাতেন এবং সুগন্ধি লাগাতে অনেক পছন্দ করতেন।

দাড়ি-গোফ : রাসূল (সা:) বলেছেন : তোমরা মুশরিকদের উল্টো করবেঃ দাড়ি লম্বা রাখবে, গোঁফ ছোট করবে।

সময়ের নির্ধারণ : আনাস (রাঃ) বলেন : রাসূলুলাহ (সা:) আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন অন্তত চল্লিশ দিনে একবার নখ কাটতে ও মোঁচ ছাঁটতে।

কথাবার্তার রীতিনীতি ঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন **: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের মতো দ্রুত গতিতে কথা বলতেন না, বরং তিনি ধীরে সুস্থে প্রতিটি শব্দ পৃথকভাবে উচ্চারণ করে কথা বলতেন, ফলে তার কাছে বসা লোক খুব সহজেই তা আয়ত্ত করে নিতে পারত।**

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কথা বুঝে নেওয়ার জন্য তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। তিনবার সালাম দিতেন। অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। সংক্ষিপ্ত কথা বলতেন, কিন্তু বিশদ অর্থবহ ও সারগর্ভ। নিরর্থক কথা বলতেন না। কেবলমাত্র সওয়াবের আশায় কথা বলতেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনো অশ্লীল ও কটুভাষী ছিলেন না, অশ্লীল ব্যবহারও করেননি। তিনি কখনো বাজারে গিয়ে হট্টগোল করতেন না।

কথাবার্তা-ভাষণ ও হাসি-কান্নার নীতিমালা ঃ

হাসি : তাঁর হাসি ছিল মুচকি হাসি। শেষ বয়সে হাসার সময় তাঁর মাঢ়ীর দাতঁ দেখা যেত।

কান্না : কখনো তিঁনি বিকট শব্দ এবং উঁচু আওয়াজে কাঁদেন নি। অথচ তাঁর অশ্রুসজল হয়ে ভেসে যেত। তাঁর বক্ষে কান্নার ক্ষীণ আওয়াজ শোনা যেত।

তাঁর কান্না কখনো মৃত্যু ব্যক্তির উপর রহমত বর্ষণের দরুন এবং কখনো উম্মতের উপর আশংকা ও দয়ার জন্য কাঁদতেন।

আবার কখনো আল্লাহর ভয়ে এবং কোরআন শ্রবণকালে রোদন করতেন।

ভাষণ : তিঁনি জমিন, মসজিদের মিম্বার, ক্রমেল ও উষ্ট্রীর উপরে সওয়ার হয়ে ভাষণ দিয়েছেন। জাবের (রাঃ) বলেন : **রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খুত্বাহ্ (ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত, কণ্ঠস্বর জোরালো হত এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত, এমনকি মনে হত, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন।** খুতবার (ভাষণের) প্রাক্কালে আল্লাহর গুণকীর্তন বর্ণনা করে আরম্ভ করতেন।

রাসূল (সাঃ) সম্মোধিত ব্যক্তিদের জরুরৎ ও তাদের কল্যাণানুগ যে কোন সময় ভাষণ পেশ করতেন।

দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র

প্রশ্ন		সত্য / মিথ্যা
১। তিনি যখন জামা পরিধান করতেন, তখন ডান দিক হতে পরা আরম্ভ করতেন?	ঃ	☐ / ☐
২। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর খাবার মাটির উপর বিছানো দস্তরখানায় রাখা হতো এটাই ছিল তাঁর খাবার টেবিল?	ঃ	☐ / ☐
৩। তিঁনি যখন সফর করে গৃহে ফিরতেন, তখন রাত্রি বেলায় (অজ্ঞাতসারে) পরিবারের নিকট প্রবেশ করতেন না। এবং তিঁনি রাতের বেলা পরিবারের কাছে (অজ্ঞাতসারে) প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন?	ঃ	☐ / ☐
৪। কখনো জঠরজ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। আবার কখনো পরিতৃপ্ত হয়েছেন?	ঃ	☐ / ☐
৫। চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন, অন্যকে আগুনের দ্বারা দাগ দিয়েছেন, কিন্তু নিজেকে দাগ দেননি?	ঃ	☐ / ☐
৬। শয়তানী কুমন্ত্রণায় প্রবঞ্চিত বিদ'আতীরা ইস্তেঞ্জা বা প্রস্রাব করার পর যেরুপ নিন্দনীয় কার্য-কলাপ করে থাকে, সেরুপ নবী (সাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় কখনো করেন নি। যেমন পুরুষাঙ্গ টানাটানি করা, (কুতাকুতি) পীড়াপীড়ি করা, লাফালাফি করা, (গোপনাঙ্গ) রশি দিয়ে বেধে রাখা, (সিড়িতে) ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ধাপে ধাপে ওপরে ওঠা, মূত্রনালীতে তুলা ভরে রাখা, কিছুক্ষণ পরপর (পুরুষাঙ্গ) দেখাদেখি করা ও পানি গড়িয়ে দেওয়া ইত্যকার প্রবঞ্চকদের নব্য আবিষ্কৃত শরিয়তপরিপন্থী কার্যক্রম?	ঃ	☐ / ☐
৭। নবী (সাঃ) একনিষ্ঠ ও অকুণ্ঠচিত্তে প্রেরিত, দু'টি বিষয়ে ছিলেন ঘোর বিরোধী : ১। আল্লাহর সাথে অংশীদারত্ব স্থাপন। ২। হালালবস্তুকে হারামকরণ?	ঃ	☐ / ☐
৮। তাঁর সন্তান-সন্ততি ছিল সাতজন। তিন ছেলে, চার মেয়ে?	ঃ	☐ / ☐
৯। রাসূল (সাঃ) এর সকল সন্তান বিবি খাদিজার গর্ভজাত। এছাড়া অন্য কোন বিবির গর্ভজাত সন্তান হয়নি?	ঃ	☐ / ☐
১০।রাসূল (সাঃ) এর সকল সন্তান তাঁর পূর্বেই শৈশবে ইন্তেকাল করেন?	ঃ	☐ / ☐
১২। রাসূল (সাঃ) তাঁর ৯ জন পত্নী জীবিত থাকাকালীন মৃত্যুবরণ করেন, এতে কোন মতানৈক্য পাওয়া যায় না। তারা হচ্ছেন যথাক্রমে : ১। আয়েশা, ২। হাফসা, ৩। যয়নব বিন জাহশ, ৪। উম্মে সালামা, ৫। সফিয়্যা, ৬। উম্মে হাবীবা, ৭। মায়মুনা, ৮। সাওদা, ৯। জুয়াইরিয়া?	ঃ	☐ / ☐
১২। আল্লাহ তায়ালা তাঁর পক্ষ থেকে জিবরাইল (আঃ) যোগে খাদিজা (রাঃ) এর জন্য সালামের পয়গাম পাঠিয়েছেন। এটি এমন এক বিশিষ্টতা, যা তিঁনি ব্যতীত অন্য কোন নারীর ক্ষেত্রে জানা যায় না?	ঃ	☐ / ☐

১৩। রাসূল (সাঃ) এর প্রিয় রঙ ছিল? সাদা ☐ কালো ☐ হাতের লাগানে পাওয়া যে কোন রঙ ☐
১৪। রাসূল (সাঃ) এর পোশাক-পরিচ্ছেদের নীতিমালা হচ্ছে : পশমের তৈরি কাপড় পরিধান করতেন না☐ সুতি এবং লিলেনের তৈরি কাপড় পরিধান করতেন, ☐ হাতের নাগালে পাওয়া যে কোন কাপড় পরিধান করতেন ☐ প্রথম ও দ্বিতীয়টি ☐
১৫। রাসূল (সাঃ) এর পোশাক-পরিচ্ছেদের নীতিমালা হচ্ছে : উন্নতমানের কাপরা পরিধান করা, ☐ সন্ন্যাস ব্রততার কারণে জীর্ণশীর্ণ কাপড় পরিধান, ☐ মধ্যমানের পোশাক পরিধান ☐
১৬। রাসূল (সাঃ) কখন বিসমিল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ বলতেন? খাবারের শুরুতে ☐ শেষে ☐ শুরু এবং শেষে ☐
১৭। রাসূল (সাঃ) এর অধিকাংশ পানীয় পানের ধরণ ছিল : উপবেশিত অবস্থায় ☐ দণ্ডায়মান অবস্থায় ☐ উভয়ই অবস্থায় ☐
১৮। রাসূল (সাঃ) বলেছেন : পার্থিব বস্তুর মধ্যে আমার নিকট পছন্দনীয় করা হয়েছে? স্ত্রী ☐ সুগন্ধী ☐ প্রাগুক্ত উভয়টাই ☐
১৯। রাসূল (সাঃ) বলেছেন : আমার নয়নের প্রশান্তি রাখা হয়েছে? জান্নাতে ☐ নামাযে ☐ প্রাগুক্ত উভয়টি ☐
২০। রাসূল (সাঃ) তাঁর পত্নীদের সাথে কিভাবে পুরো জীবন কাটিয়েছেন? সুসৌহার্দ্যপুর্ণভাবে? ☐ উত্তম চরিত্রে ভূষিত হয়ে? ☐ প্রাগুক্ত উভয়টি ☐
২১। আনাস রাঃ বলেন : রাসূলুলাহ (সা:) আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন অন্তত (------------------) একবার নখ কাটতে ও মোঁচ ছাঁটতে : ত্রিশদিন☐ চল্লিশদিন ☐ পঞ্চাশদিন ☐
২২। মাথা মুণ্ডনের ব্যাপারে তাঁর সুন্নাত ছিল, মাথার কিয়দাংশ কাটা, আর কিয়দাংশ রেখে দেওয়া ☐ হয় সবটুকু কামিয়ে ফেলা নতুবা সবটুকু রেখে দেওয়া ☐
২৩। রাসূল (সাঃ) মেসওয়াক করা পছন্দ করতেন, তিনি মেসওয়াক করতেন : রোযা না রাখা অবস্থায়, ☐ রোযা রাখা অবস্থায় ☐ উভয় অবস্থায় ☐
২৪। রাসূল (সাঃ) হাসি : সম্পূর্ণ মুচকি ☐ অধিকাংশ সময় মুচকি ☐
২৫। রাসূল (সাঃ) প্রেরিত হয়েছেন : সমগ্র মানবজাতির জন্য, ☐ সাকালাইন জিন ও ইনসানের জন্য ☐
২৬। সম্যকরূপে, রাসূল (সাঃ) এর শ্রেষ্ঠ কন্যা কে ছিলনে? সকলই ☐ ফাতেমা (রাঃ) ☐ যয়নব (রাঃ) ☐
২৭। রাসূল (সাঃ) এর উপর কোন স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো শয্যায় শায়িত থাকাকালীন ওয়াহী নাযিল হয়নি? হাফসা, ☐ উম্ম সালামাহ ☐ আয়েশা ☐

রাসূল (সাঃ) ঃ	জানাযায়,	দাওয়াত,	পতিহীনা, দুস্থ, ও স্থবিরদেও প্রয়োজনের পাশে,	অসুস্থ,
সেবা-শুশ্রুষা করতেন ঃ	☐	☐	☐	☐
উপস্থিত হতেন ঃ	☐	☐	☐	☐
গ্রহণ করতেন ঃ	☐	☐	☐	☐
দাড়াতেন ঃ	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) এর কার্যাদি :	বকরীর,	মসজিদ বিনির্মানে ইট,	স্বহস্তে কাপড়ে,	স্বহস্তে জুতা,	নিজের ও পরিবার পরিজনের
মেরামত করেছেন ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
তালি লাগিয়েছেন ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
দুধ দোহন করেছেন ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
পরিচর্যা করেছেন ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
বহন করেছেন ঃ	☐	☐	☐	☐	☐

স্বভাবগত ফিতরাত ঃ	নখ,	বগলের পশম,	নাভীর নিম্নাংশের চুল,	দাড়ি,	গোঁফ,
কাটা ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
লম্বা করা ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
কাটা ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
উপড়িয়ে ফেলা ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
কামানো ঃ	☐	☐	☐	☐	☐

খাবারদ্রব্যে রাসূল (সাঃ) এর রীতিনীতি :	অনুপস্থিত খাবার	তৎক্ষনাৎ আহার করে নিতেন,	হারামের হুকুম না লাগিয়ে পরিহার করতেন,	উপস্থিত খাবার
১। ফিরিয়ে দিতেন না। ঃ	☐	☐	☐	☐
২।লিপ্সাযুক্ত কিসের জন্য কষ্ট পেতেন না। ঃ	☐	☐	☐	☐
৩।যে কোন পাক-পবিত্র আহার্য তাঁর সম্মুখে পরিবেশন করা হলে ঃ	☐	☐	☐	☐
৪।তবে খাবারের সাথে অভিরুচি না মিললে ঃ	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সা:) :	খাবার শেষে,	খাদ্য গ্রহণ,	এক আঙ্গুল দিয়ে,	পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে আত্মতৃপ্তি দূর করে,	তিন,
১।কয়টি আঙ্গুল দ্বারা খেতেন? ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
২।আঙুল চেটে খেতেন ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৩।সবথেকে ভদ্রোচিত ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৪।কেননা দাম্ভিক অহংকারী ব্যক্তি পানাহার করে ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৫।এবং প্রচণ্ড ক্ষুধাকাতর লোলুপ ব্যক্তি পানাহার করে ঃ	☐	☐	☐	☐	☐

অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

একনিষ্ঠ ও অকুণ্ঠচিত্তে প্রেরিত : ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) বলেছেন : আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাঝে একাগ্রতা ও বদান্যতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তিঁনি যেমন আল্লাহর একাত্বতা পালনে ছিলেন ন্যায়-নিষ্ঠ তেমনি চারিত্রিকভাবে ছিলেন উদারচেতা মনোভাবের।
দুটি বিষয়ে ছিলেন ঘোর বিরোধী : ১। আল্লাহর সাথে অংশীদারত্ব স্থাপন। ২। হালালবস্তুকে হারামকরণ।

জ্বিন ও ইনসানের নিকট প্রেরিত : রাসূল (সা:) বলেছেন **: সমস্ত নবী প্রেরিত হতেন কেবল তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য, আর আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সমগ্র মানব জাতির জন্য।**

তাঁর উপর নাযিলকৃত কিতাব ও তাঁর দাওয়াতি-তৎপরতা : আল্লাহ তায়ালা বলেন **: আলিফ-লাম-রা; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমরা আপনার প্রতি নাযিল করেছি-যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন-পরাক্রান্ত, প্রশংসার যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে। (সূরা ইব্রাহীম)।**

নিদর্শনাবলি : তাঁর সবথেকে বড় নিদর্শন হচ্ছে আল-কুরআন। পূর্ববর্তী নবী ও রাসূলদের প্রদানকৃত যে কোন নিদর্শনের বিরাট একটি অংশ তাকেও দেওয়া হয়েছিল।

তাঁর মহব্বত দীনের একটি অংশ : রাসূল (সা:) বলেছেন : **তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষন না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান ও সব মানুষের অপেক্ষা অধিক প্রিয়পাত্র হই।**

তাঁকে অপছন্দকারীর হুকুম : জঘন্যতম কুফুরকারী একজন কাফের। আল্লাহ তায়ালা বলেন **: যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ। (সূরা কাওসার)।**

আল্লাহর একান্ত বন্ধু : রাসূল (সাঃ) বলেছেন : মহান আল্লাহ ইব্রাহীমকে যেমন খলীল বা একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সে রকমভাবে আমাকেও খলীল বা একান্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

উচ্চ সাহসী পয়গম্বরদের একজন : আল্লাহ তায়ালা বলেন : যখন আমি পয়গম্বরগণের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মরিয়ম তনয় ঈসার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম এবং অঙ্গীকার নিলাম তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার। (সূরা আল আহযাব)।

জ্ঞান-গরিমা : রাসূল (সাঃ) বলেন : শোনে রাখো আমি তোমাদের থেকে আল্লাহকে অধিক বেশি জানি।
আল্লাহ তায়ালা বলেন : আপনি বলুন ঃ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমন বলি না যে, আমি ফেরেশতা। (সূরা আল আন-আম)।

তাঁর আনুগত্যকারী এবং বিরুদ্ধাচারীর হুকুম : আল্লাহ তায়ালা বলেন : বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। (সূরা আল ইমরান)। অন্যেত্রে আরো বলেন : আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে। (সূরা আল ইমরান)।
রাসূল (সাঃ) বলেন : তোমরা সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করে। তারা বললেনঃ কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেনঃ যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করবে।
তিনি আরো বলেন : যে ব্যক্তি আমার নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাঁর জন্য অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত আছে।

উম্মত : আল্লাহ তায়ালা বলেন : তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা আল ইমরান)।
রাসূল (সাঃ) বলেছেন : শপথ ঐ সত্তার, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ আমি অবশ্যই আশা রাখি যে তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে।

নগরী : তাঁর নগরী হচ্ছে মক্কা। আল্লাহ তায়ালা বলেন : নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য

হেদায়েত ও বরকতময়। এতে রয়েছে মকামে ইব্রাহীমের মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে, লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ্ব করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার। আর যে লোক তা মানে না। আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না। (সূরা আল ইমরান)
আর মক্কা হচ্ছে সম্মানিত শহর। তিঁনি বলেন : এ নগরীকে আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকে সম্মানিত করেছেন। কাজেই তা আল্লাহ্‌র দেয়া সম্মানের দ্বারা ক্বিয়ামাত অবধি সম্মানিত থাকবে।
এ নগরী কিয়ামত অবধি মুসলমানদের জন্য। আল্লাহর নবী বলেন : মক্কা বিজয়ের পর আর কোন হিজরত নেই।

সলাতের সময় মুখ ফিরানোর দিক (কেবলা) : কা'বা অভিমুখে তাঁর কেবলা । তৎপূর্বে বায়তুল মাক্বদিস অভিমুখে ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন : নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমরা আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। (সূরা আল বাক্বারাহ)।
মাসজিদুল হারাম ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ। আবু যর (রাঃ) বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে পৃথিবীতে নির্মিত সর্বপ্রথম মসজিদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, মাসজিদুল হারাম (সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল)।
আল্লাহর নবী (সাঃ) আরো বলেন : যে ব্যক্তি এ (কা'বাহ্) ঘরে (হাজ্জের উদ্দেশে) আসে, অতঃপর অশ্লীল আচরণও করে না এবং দুষ্কর্মও করে না সে এমন নিষ্পাপ ভাবে প্রত্যাবর্তন করে যে তার জননী তাকে (নিষ্পাপ অবস্থায়) প্রসব করেছেন।
তিঁনি আরো বলেন : মসজিদে হারামে (কাবার মসজিদে) এক ওয়াক্ত সলাত অন্যান্য মসজিদে এক লক্ষ সলাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমার মসজিদে (মসজিদে নববী) এক ওয়াক্ত সালাত এক হাজার সালাতের চেয়েও উত্তম। আর বায়তুল মাক্বদিস মসজিদে এক ওয়াক্ত সলাত পাঁচশত গুণ উত্তম ফাজীলাতপূর্ণ। তিঁনি আরো বলেন : মসজিদুল হারাম, আমার মসজিদ (নববী) এবং মসজিদুল আক্‌সা (বায়তুল মাক্‌দিস) তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে (সালাতের) উদ্দেশে হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করা যাবে না)। তিঁনি আরো বলেন : যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও , তখন ক্বিবলার দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠও দিবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে।

নিকটাত্মীয় এবং বিবিগণ ঃ

তাঁর সন্তান-সন্ততি ছিল সাতজন। তিন ছেলে, চার মেয়ে :

১। ক্বাসেম। তার নামেই রাসূল (সাঃ) কে আবুল ক্বাসেম বা ক্বাসেমের পিতা বলা হতো।
২। যয়নব (রা:)।
৩। রুক্বায়য়া (রাঃ)
৪। উম্মে কুলসুম (রাঃ)
৫। ফাতেমা (রাঃ)।
৬। আব্দুল্লাহ। তার উপাধি ছিলো তাইয়েব ও তাহের।
৭। ইবরাহীম। নবী (সাঃ) এর উপপত্নী মারিয়া বিনতে শামউন আল-কিবত্বিয়্যা গর্ভজাত সন্তান।
বাকী সকল সন্তান ছিলেন বিবি খাদিজার গর্ভজাত। এছাড়া অন্য বিবিদের গর্ভজাত সন্তান হয়নি।

ফাতেমা ব্যতীত পুত্র সন্তান সকলই শৈশবে ইন্তেকাল করেন। আর ফাতেমা (রাঃ) তাঁর আব্বা রাসূল (সাঃ)-এর ইন্তেকালের মাত্র ছয় মাস পরই ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর স্থৈর্য ও পূন্যতার উদ্দীপনা দেখে সুউচ্চ মর্তবায় সমুন্নত করেছেন যা বিশ্ব-রমণীদের উপর গৌরবান্বিত করেছে। আর সমক্র্যরুপে তিনিই তাঁর কন্যাদের মধ্যে সেরা ছিলেন। অবশ্যই কন্যারা সবাই ইসলামের যুগ পেয়েছিলেন। তাঁরা সকলই ইসলাম গ্রহন এবং তাঁর সাথে হিজরত করার গৌরব অর্জন করেন।

তাঁর চাচাবর্গ সংখ্যায় এগারোজন ছিলেন :

১। হামজা (রা:) (শহীদগনের সর্দার)।
২। আব্বাস (রাঃ)।
৩। আবু তালেব। (তার নাম আবদে মানাফ)
৪। আবু লাহাব, (তাঁর নাম : আব্দুল উজ্জা)।
৫। যুবায়ের
৬। আব্দুল কাবাহ।
৭। আল-মুক্বাওয়িম।
৮। জিরার।

৯। কুসাম।
১০। মুগীরা, তার উপাধি নাম হাজাল।
১১। গায়দাক্ব, (তার নাম : মুসাব)।
হামজা এবং আব্বাস (রাঃ) ব্যতীত আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেননি।

তাঁর চাচীবর্গ ছিলেন ছয়জন :

১। সফিয়্যা, তিনি যুবায়ের বিন আওয়াম এর জননী।
২। উম্মু হাকিম আল-বায়জা।
৩। আতিকা।
৪। বাররাহ।
৫। আরওয়া।
৬। উমায়মা।

বিবিগণের নাম (সাঙ্কেতিক চিহ্ন : سمعه . صخر . حجز)

الحاء : হাফসা বিনতে উমার বিন খাত্তার (রা:)
الجيم : জুয়াইরা বিনতে হারিস (রা:)
الزاي : যয়নব বিনতে জা্হশ+যয়নব বিনতে খুজায়মা (রা:)

الصاد : সফিয়্যা বিনতে হুয়ায় বিন আখতাব (রাঃ)
الخاء : খাদিজা বিনতে খুওয়ালিদ (রাঃ)
الراء : উম্ম হাবিবা রুমলা বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ)

السين : সাওদা বিনতে যামআ (রাঃ)
الميم : মাইমুনা বিনতে হারিস (রাঃ)
العين : আয়েশা বিনতে আবু বকর (রাঃ)
الهاء : উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে উমায়য়া (রাঃ)

খাদিজা (রাঃ) : খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ আল-কুরাশি আল-আসাদি রাসূল (সাঃ) এর সর্বপ্রথমা স্ত্রী। রাসূল (সাঃ) তাঁর সাথে নবুয়তের পূর্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন খাদিজা (রাঃ) বিবির বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তাঁর তিরোধানের পূর্বে রাসূল (সাঃ) অন্য কোন মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। ইবরাহীম ব্যতীত রাসূল (সাঃ) এর সকল সন্তান তাঁর গর্ভজাত ছিল। এবং তিঁনিই রাসূল (সাঃ) কে নবুয়তপ্রাপ্তিতে সহযোগিতা করেছেন এবং তাঁর সাথে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছেন। মন-প্রাণ ও ধন-সম্পদ দিয়ে তাঁর পাশে থেকেছেন। আল্লাহ তায়ালা নিজের পক্ষ

থেকে জিবরাইল (আঃ) যোগে তাঁর জন্য সালামের পয়গাম পাঠিয়েছেন। এটি এমন এক বিশিষ্টতা, যা তিঁনি ব্যতীত অন্য কোন নারীর ব্যাপারে জানা যায় না। তিঁনি হিজরতের তিন বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন।

সাওদা (রাঃ) : রাসূল (সাঃ) খাদিজা (রাঃ) এর ইন্তেকালের কিছুদিন পরেই সাওদা বিনতে যামআর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিঁনিই তাঁর নির্ধারিত দিন আয়েশা (রাঃ) -কে দান করেছিলেন।

আয়েশা (রাঃ) : রাসূল (সাঃ) সাওদা (রাঃ) এর পরে হযরত সিদ্দিকের দুহিতা আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) কে বিবাহ করেন। সাত আসমানের উপর থেকে যার নির্দোষিতার ও নিষ্কলুষতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। তিঁনি ছিলেন আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) এর প্রিয়তমা স্ত্রী। জিবরাইল ফেরেশতা (আঃ) রাসূল (সাঃ) কে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে একখানা সবুজ রেশমী কাপড়ে তাঁর প্রতিচ্ছবি পেশ করেছিলেন। এবং বলেছিলেন : ইনি আপনার স্ত্রী। নবুয়তের একাদশ বর্ষের শাওয়াল মাসে রাসূল (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছয় বছর। রাসূল (সাঃ) তাঁর সাথে হিজরতের প্রথম বছর শাওয়াল মাসে বাসর উদযাপন করেন। সে সময় তাঁর বয়স ছিল নয় বছর। রাসূল (সাঃ) তাঁকে ব্যতীত আর কোন কুমারী মেয়ে বিবাহ করেননি। তাঁর উপর আয়েশা (রাঃ) ছাড়া অন্য কারো শয্যায় শায়িত থাকাকালীন ওয়াহী নাযিল হয়নি। আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকট সৃষ্টিজগতের সর্বাধিক প্রিয়তমা ছিলেন। তিঁনি একজন সর্বপ্রথম নারী, যার ক্ষমার ঘোষণা খোদ আসমান থেকে নাযিল হয়েছে। তাঁর কুৎসা রটনাকারী কাফের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উম্মতের সমস্ত উলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন। বিবিদের মধ্যে তিঁনি ছিলেন মাসআলার ব্যাপারে অধিক পণ্ডিত ও বিদ্বান। বরঞ্চ সর্বোতভাবে উম্মতে মোহাম্মাদীর সকল নারীদের মধ্যে তিঁনি ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ও জ্ঞানী। অধিকন্তু, শীর্ষস্থানীয় সাহাবীরা তাঁর অভিমতের দিকে ফিরে যেত এবং তাঁর নিকছ ফাতওয়া জিজ্ঞাস করতেন।

হাফসা (রাঃ) : এরপর হাফসা বিনতে উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) কে বিবাহ করেন। সে তাঁর প্রথম স্বামী খুনাইস ইবনে হোযাফা আস-সাহমীর সাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে মদিনায় হিজরত করেন। তাঁর স্বামী উহুদ যুদ্ধের পরে মারা গেলে রাসূল (সাঃ) তাঁর সাথে তৃতীয় হিজরীতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

যয়নব বিনতে খুযায়মা : অতঃপর তিঁনি যয়নব বিনতে বিনতে খুযায়মা বিন হারিস আল-ক্বায়সিয়্যা কে বিবাহ করেন। তিঁনি বনু হেলাল বিন আমের গোত্রের সাথে সম্পর্কিত। তিঁনি রাসূল (সাঃ) এর নিকট বিবাহের দু'মাস পর ইন্তেকাল করেন। গরীব মিসকিনদের প্রতি তাঁর অসামান্য মমত্ববোধ এবং ভালবাসার কারণে তাঁকে উম্মুল মাসাকিন উপাধি প্রদান করা হয়।

উম্মে সালামা (রাঃ) : অতঃপর তিঁনি উম্মে সালামা হিন্দ বিনতে আবু উমায়্যা আল-কুরাশিয়্যা আল-মাখযুমিয়্যা কে বিবাহ করেন। আবু উমায়্যার নাম হচ্ছে : হুজায়ফা ইবনুল মুগীরা। রাসূল (সাঃ) এর বিবিদের মধ্যে উনি ছিলেন সর্বশেষ মৃত্যুবরণকারী স্ত্রী। তিঁনি বাষেট্টী হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন।

জুয়াইরা (রাঃ) : এরপর তিঁনি জুয়াইরা বিনতে হারিস বিন আবু জিরার আল-মুসত্বালিকিয়্যা (রাঃ) কে বিয়ে করেন। হযরত জুয়াইরা বনু মোস্তালেকের যুদ্ধবন্দীদের একজন ছিলেন। তিঁনি রাসূল (সাঃ) এর কাছে এসে দাসমুক্তির ধার্যকৃত অর্থ চেয়ে সহযোগিতা কামনা করলেন। ফলে রাসূল (সাঃ) তাঁর নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করতঃ তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করে তাঁকে বিবাহ করলেন।

যয়নব বিনতে জাহশ (রাঃ) : অতঃপর তিঁনি যয়নব বিনতে জাহশকে বিবাহ করেন। তিঁনি বনু আসাদ বিন খুযায়মা গোত্রের মহিলা। তিঁনি রাসূল (সাঃ) এর ফুফা উমায়মা এর কন্যা ছিলেন। তাঁর প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা বলছেন **: অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম। সূরা আল-আহযাব।**
যাইনাব (রাঃ) নবীর অন্যান্য স্ত্রীর কাছে এ বলে গর্ব করতেন যে, তোমাদেরকে বিয়ে দিয়েছে তোমাদের পরিবার-পরিজন, আমার আমাকে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সাত আসমানের ওপরে বিয়ে দিয়েছেন। **তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ :** স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই সাত আসমানের ওপরে তাঁর ওলী হয়ে রাসূল (সাঃ) এর সাথে বিবাবের বন্দোবস্ত করেছেন। তিঁনি উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) এর খেলাফত আমলের প্রাক্কালে মৃত্যু বরণ করেন। তিঁনি প্রথমে রাসূল (সাঃ) এর পালকপুত্র যায়দ ইবনে হারেসার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁর সাথে যায়েদের বনিবনা না হওয়ার কারনে তালাক দিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা যয়নবকে রাসূল (সাঃ) এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলেন। যাতেকরে উম্মতের লোকেরা পরবর্তীতে পোষ্যপুত্রদের পত্নীদেরকে বিবাহ করার মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) এর আদর্শ গ্রহন করতে পারে।

উম্মে হাবীবা (রাঃ) : এরপর তিঁনি উম্মে হাবীবা (রাঃ) কে বিয়ে করেন। তাঁর নাম ছিল : রমলা বিনতে আবু সুফিয়ান সাখর বিন হারব আল-কুরাশিয়্যা আল-আমাবিয়্যা। রাসূল (সাঃ) তাঁকে হাবশায় হিজরতরত অবস্থায় বিবাহ করেন। বাদশা নাজ্জাশী তাঁর পক্ষ থেকে রাসূল (সাঃ) এর জন্য চারশত দিনার মোহর ধার্য করেছিলেন। যা তাঁর কাছে সেখান থেকে আনা হয়ে ছিল। উম্মে হাবীবা (রাঃ) তাঁর সহোদর ভাই মুয়াবিয়া (রাঃ) এর খেলাফতের সময়কালে মারা যান।

সফিয়্যা (রাঃ) : এরপর রাসূল (সাঃ) সফিয়্যা বিনতে হুয়ায় বিন আখতাব কে বিবাহ করেন। তিঁনি ছিলেন বনু নাযির গোত্রের সর্দার মুসা (আঃ) এর ভ্রাতা হারুন বিন ইমরান (আঃ) এর বংশধর। তিঁনি একাধারে একজন নবীর বংশীয় কন্যা পাশাপাশি আরেকজন নবীর স্ত্রী। তিঁনি বিশ্বের সবথেকে রূপবতী নারী ছিলেন। খায়বার যুদ্ধে তিঁনি রাসূল (সাঃ) এর নিকট যুদ্ধবন্দী হিসেবে ছিলেন। তারপর নবী (সাঃ) তাঁকে নিজের জন্য পছন্দ করেন এবং মুক্ত করে দিয়ে তাঁর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এবং তাঁর মুক্তিদানকে মাহররূপে গণ্য করেন। ফলশ্রুতিতে এটি সুন্নাতে পরিণত হয়ে যায়।

মায়মুনা (রাঃ) : তারপর তিঁনি মায়মুনা বিনতে হারিস আল-হিলালিয়্যা (রাঃ) কে বিবাহ করেন। রাসূল (সাঃ) তাঁকেই সর্বশেষ স্ত্রী হিসেবে বিবাহ করেন। মক্কা নগরীতে কাযা ওমরা শেষ করে সঠিক অভিমত অনুযায়ী এহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর নবী করিম (সাঃ) তাকে বিয়ে করেন।

রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের সময় স্ত্রীদের নয় জন জীবিত ছিলেন, এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। রাসূল (সাঃ) এর ওফাতের পর বিশ হিজরিতে যয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ) সর্বপ্রথম মৃত্যু বরণ করে তাঁর সাথে যুক্ত হন। আর সর্বশেষ মৃত্যু বরণকারী ছিলেন উম্মে সালামা (রাঃ)। তিঁনি বাষোট্টী হিজরি ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া এর খেলাফত আমলে মারা যান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : জীবন-চরিত ঃ

প্রথম অধ্যায় : নবুয়তের পূর্বের জীবন ঃ

রাসূল (সাঃ) এর জন্ম : রাসূল (সাঃ) হিজরতের ৫৩ বছর পূর্বে রবীউল আওয়াল মাসের সোমবার মোতাবেক **৫৭১** খ্রীস্টাব্দে মক্কায় হস্তী যুদ্ধের ঘটনার বছর জন্ম গ্রহণ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য মক্কা থেকে হাতীকে রোধ করেছেন। হস্তীবাহিনী নাসারাদেরকে আল্লাহ তায়ালা বিজয়দানের মাধ্যমে তাঁকে ও তাঁর বংশকে বিশেষ হাদিয়া দিয়েছেন।

পিতা : তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। তিনি রাসূল (সাঃ) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মৃত্যু বরণ করেন। সুতরাং রাসূল (সাঃ) ইয়াতিমাবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন।

মাতা : তাঁর মাতার নাম আমেনা বিনতে ওহাব। তিনি ছিলেন বনু জুহারা গোত্রের। রাসূল (সাঃ) এর সাত বছর পূর্ণ না হতেই তিনিও মৃত্যু বরণ করেন।

দায়-দায়িত্বভার গ্রহন : শৈশবকালে রাসূল (সা:) এর মাতা আমেনার মৃত্যুর পরে তাঁর পিতামহ ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহন করেন। আট বছরের মত বয়সে দাদাও মৃত্যু বরণ করেন। অবশেষে, চাচা তাঁর দৌহিত্রের জিম্মাদার হন। যার নাম ছিল আবদে মানাফ।

ধাত্রীদ্বয় :

১। সুয়ায়বা : আবু লাহাবের দাসী। সে রাসূল (সা:) কে সহ আবু সালামা আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদ আল-মাখযুমীকেও তার কোলশিশু মাছরুহের সাথে দুধ পান করিয়েছেন। সে এই দুজনকে দুধ পান করানোর আগে রাসূল (সাঃ) এর চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকেও দুধপান করিয়েছেন।

২। হালিমাতুস সাদিয়া : হালিমাতুস সাদিয়া রাসূল (সা:) কে তাঁর কোলের শিশু ওনায়সা এবং জুযামা -(জুযামার উপাধি ছিল শাইমা) এর ভাই আব্দুল্লাহ এর সাথে দুধপান করান। এরা সকলেই হারিস বিন আব্দুল উযযা বিন রিফায়া আস-সাদী এর সন্তানাদি। রাসূল (সা:) এর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব কেও তাঁর সাথে দুধপান করান।

রাসূল (সা:) এর মাতৃকোল :

১। তাঁর জন্মদাত্রী মা আমেনা।

২। সুওয়ায়বা। আবু লাহাবের আযাদকৃত দাসী।

৩। হালিমা বিনতে আবু জুআয়িব আস-সাদিয়া।

৪। **শাইমা :** তিঁনি ছিলেন হালিমাতুস সাদিয়ার কন্যা এবং রাসূল (সা:) এর দুধবোন। তিনিও তাঁর মার সাথে রাসূল (সাঃ) কে কোলে-পিঠে লালনপালন করেন। তিনি হাওয়াযেন গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূল (সা:) নিকট আগমন করেছিলন। অতঃপর রাসূল (সা:) গুরুত্ব সহকারে তার হক্ব পালন করতঃ নিজের চাদর বিছিয়ে বসতে দেন।

৫। উম্মু আয়মান : তার নাম ছিল বরকত আল-হাবশী। পিতার পক্ষ থেকে রাসূল (সাঃ) তাঁর ওয়ারিস ছিলেন। তিনি রাসূল (সা:) এর ধাত্রীও ছিলেন। রাসূল (সা:) তাঁকে তাঁর বন্ধু যায়দ বিন হারিসা (রা:) এর সাথে বিবাহ দেন। ফলে তাঁর গর্ভে উসামা বিন যায়েদ (রা:) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর নিকট রাসূল (সা:) এর মৃত্যুর আবু বকর এবং উমার (রা:) প্রবেশ করলে তিনি ক্রন্দন করছিলেন। তারা উভয়ই তাঁকে বললেন : তুমি কাদছ কেন? তাল্লাহ তায়ালার নিকট যা আছে তা তাঁর রাসূলের জন্য সর্বাধিক উত্তম নয়? তিনি বললেন : আমি নিশ্চিত জানি, আল্লাহ তায়ালার নিকট যা আছে তা তাঁর জন্য সর্বাধিক উত্তম। এবং আমি এটাও জানি যে, তিনি যে স্থানে (দুনিয়ায়) ছিলেন তার চেয়ে উত্তম জায়গা (আখিরাতে) গমন করেছেন বরং আমি এজন্য কাদছি যে, আমাদের থেকে থেকে ওহী নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। উম্মু আইমানের এ কথা তাঁদেরকে কান্নাপ্লুত করে তুলল। অতএব তাঁরাও তাঁর সঙ্গে কাঁদতে শুরু করলেন।

পেশা : রাসূল (সা:) বকরী চরিয়েছেন। এ পেশাই তাকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং দুর্বলদের প্রতি গুরুত্বারোপকারী এবং অনুগ্রহকারী বানিয়েছে । নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : **আল্লাহ্ তা’আলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী না চরিয়েছেন। তখন তাঁর সাহাবীগণ বলেন, আপনিও? তিনি বলেন, হ্যাঁ; আমি কয়েক কীরাতের (মুদ্রা) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম।**

তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিবাহ-শাধি : রাসূল (সা:) যখন পঁচিশ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন ব্যবসা-বাণিজ্যিক কাজে তিনি সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে বোসরা পৌছার পর আবার ফিরে আসেন। ফিরার পথে তাঁর সর্বপ্রথমা স্ত্রী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদকে বিবাহ করেন।

কাবাঘর পুনর্নির্মাণ : রাসূল (সা:) যখন পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন কাবাঘরের জীর্ণশীর্ণতা পরিলক্ষিত হয়। সে সময় কোরায়শরা নতুন করে কাবা ঘর নির্মাণের কাজ শুরু করে। কুরাইশের প্রত্যেক গোত্র-উপগোত্র নিজেদের নির্মাণ কাজের আলাদা আলাদা অংশ ভাগ করে নিয়েছিল। প্রত্যেক গোত্রই পাথরের আলাদা আলাদা স্তুপ লাগিয়ে রাখে। ইমারত যখন হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত ওঠে তখন ঝগড়া বাধলো, এ পবিত্র পাথর যথাস্থানে স্থাপনের মর্যাদা কে লাভ করবে? চার পাচ দিন যাবত এ ঝগড়া চলতে থাকে অতঃপর তারা সর্বসম্মতিক্রমে এ ফায়সালায় উপনীত হলো যে, আগামীকাল প্রত্যূষে মসজিদে হারামের দরজা দিয়ে যিনি সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন, তিঁনিই তাদের মাঝে এ বিষয়ের আশু সুরাহা দিবেন। পরদিন প্রত্যূষে (সা:) সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন। এবং তিঁনিই তাদের মাঝে এ সমস্যার সমাধান করে দিলেন তখন তিঁনি একখানা চাদর চেয়ে আনান এবং তা মাটিতে বিছিয়ে নিজ হাতে হাজারে আসওয়াদ চাদরের মাঝখানে রাখেন। তারপর বিবদমান গোত্রসমূহের নেতাদের সেঁ চাদরের কিনারা ধরে পাথর যথাস্তানে নিয়ে যেতে বললেন। তাই তারা করে। নির্ধারিত জায়গায় চাদর নিয়ে যাওয়ার পর রাসূল (সা:) নিজ হাতে পাথর যথাস্থানে পাথর স্থাপন করেন। এ ফয়সালা ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞোচিত এবং বুদ্ধিদৃপ্ত।

একাকিত্বতা : আয়েশা (রা:) বলেন : **অতঃপর তাঁর নিকট নির্জনতা পছন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি ‘হেরা’র গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে- এভাবে সেখানে তিনি এক নাগাড়ে বেশ কয়েক দিন ‘ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন।** আর প্রতিমা-মূর্তি ও মূর্তিপূজক সম্প্রাদায়ের ধর্ম-বিশ্বাসকে তাঁর নিকট অপছন্দনীয় করা হয়েছিল। তাই তাঁর নিকট এর থেকে ঘৃণিতর বিষয় আর কিছুই ছিল না

দ্বিতীয় অধ্যায় : ওহীর সূচনা ঃ

রাসূল (সা:) এর চল্লিশ বছর পূর্ণকালে তাঁর উপর নবুয়তের প্রদীপ উদ্ভাসিত হয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সোমবার দিন তাঁর রিসালাত প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন।

নবুওয়ত : আয়েশা (রা:) বলেন : আল্লাহর রসূল (সা:)- এর নিকট সর্বপ্রথম যে ওয়াহী আসে, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় বাস্তব স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হতো। অতঃপর তাঁর নিকট নির্জনতা পছন্দনীয় হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি 'হেরা'র গুহায় নির্জনে অবস্থান করতেন। আপন পরিবারের নিকট ফিরে এসে কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে- এভাবে সেখানে তিনি এক নাগাড়ে বেশ কয়েক দিন 'ইবাদাতে মগ্ন থাকতেন। অতঃপর খাদীজা (রাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে আবার একই সময়ের জন্য কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে যেতেন। এভাবে 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট ওয়াহী আসলো। তাঁর নিকট ফেরেশতা এসে বললো, 'পাঠ করুন'। আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ["আমি বললাম, 'আমি পড়তে জানি না।] তিনি (সা:) বলেনঃ অতঃপর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, 'পাঠ করুন'। আমি বললামঃ আমি তো পড়তে জানি না'। সে দ্বিতীয় বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলো যে, আমার খুব কষ্ট হলো। অতঃপর সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, 'পাঠ করুন'। আমি উত্তর দিলাম, 'আমি তো পড়তে জানি না'। আল্লাহর রসূল (সা:) বলেন, অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পাঠ করুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত পিন্ড থেকে, পাঠ করুন, আর আপনার রব অতিশয় দয়ালু"- (সূরা আলাক্ব ৯৬/১-৩)। অতঃপর এ আয়াত নিয়ে আল্লাহর রসূল (সা:)- প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর হৃদয় তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিন্‌তু খুওয়ায়লিদের নিকট এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর', 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর'। তাঁরা তাঁকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। এমনকি তাঁর শংকা দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রাঃ) এর নিকট ঘটনাবৃত্তান্ত জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি। খাদীজা (রাঃ) বললেন, আল্লাহর কসম, কখনই নয়। আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুন্দশাগ্রস্থকে সাহায্য করেন। অতঃপর তাঁকে

নিয়ে খাদীজা (রাঃ) তাঁর চাচাত ভাই ওয়ারাকাহ ইব্‌নু নাওফাল ইব্‌নু ‘আবদুল আসাদ ইব্‌নু ‘আবদুল ‘উযযাহ’র নিকট গেলেন, যিনি অন্ধকার যুগে ‘ঈসায়ী ধর্ম গ্রহন করেছিলেন। যিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে পারতেন এবং আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল হতে ভাষান্তর করতেন। তিনি ছিলেন অতি বৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। খাদীজা (রাঃ) তাঁকে বললেন, ‘হে চাচাত ভাই আপনার ভাতিজার কথা শুনুন’। ওয়ারাকাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ভাতিজা তুমি কী দেখ?’ আল্লাহর রসূল (সা:) যা দেখেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন। তখন ওয়ারাকাহ তাঁকে বললেন, এটা সেই বার্তাবাহক যাকে আল্লাহ মূসা (‘আঃ)- এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসোস আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বহিষ্কার করবে’। আল্লাহর রসূল (সা:) বললেন, [‘তারা কি আমাকে বের করে দেবে?’] তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো অনুরূপ (ওয়াহী) কিছু যিনিই নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে জোরালোভাবে সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকাহ (‘আঃ) ইন্তিকাল করেন। আর ওয়াহীর বিরতি ঘটে।

রাসূল (সা:) বলেছেন : একদা আমি হাঁটছি, হঠাৎ আসমান থেকে একটা শব্দ শুনতে পেয়ে আমার দৃষ্টিকে উপরে তুললাম। দেখলাম, সেই ফেরেশতা, যিনি হেরা গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন, আসমান ও যমীনের মাঝে একটি আসনে উপবিষ্ট। এতে আমি শংকিত হলাম। অবিলম্বে আমি ফিরে এসে বললাম, ‘আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর’, ‘আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর’। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা অবতীর্ণ করলেন, “হে বস্ত্রাবৃত রসূল (১) উঠুন, সতর্ক করুন; আর আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন; এবং স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখুন; (৫) এবং অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকুন”। (সূরা মুদদ্দাসসির ৭৪/১-৫) অতঃপর ওয়াহী পুরোদমে ধারাবাহিক অবতীর্ণ হতে লাগল।

ওহীর বিভিন্ন স্তর ঃ

১। সত্য স্বপ্ন : যার মাধ্যমে রাসূল (সা:) এর উপর ওহী নাযিল সূচিত হয়।

আয়েশা (রা:) বলেন : যে স্বপনই তিঁনি দেখতেন, তা একেবারে প্রভাতের আলোর ন্যায় প্রকাশিত হতো।

২। অন্তরে কথা প্রক্ষেপণ করা : ফেরেশতা তাঁকে না দেখেই তাঁর মনে কথা প্রক্ষেপণ করতেন। যেমন নবী করিম (সা:) বলেছেন : রুহুল আমীন আমার মনে এ কথা বসিয়ে দিলেন যে, কোন মানুষ তার জন্য নির্ধারিত রিযিক্ব পুরোপুরি পাওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করে না।

৩। ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধরে আসতেন : রাসূল (সা:) বলেছেন : আবার কখনো মালাক মানুষের রূপ ধারণ করে আমার সাথে কথা বলেন। তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্ত করে নেই। এ স্তরে কখনো কখনো সাহাবায়ে কেরামও ফেরেশতাকে দেখতে পেতেন।

৪। ঘন্টাধ্বনির মত টন টন শব্দ : রাসূল (সা:) বলেছেন : **কোন কোন সময় তা ঘন্টা বাজার মত আমার নিকট আসে। আর এটি-ই আমার উপর সবচেয়ে বেদনাদায়ক হয় এবং তা শেষ হতেই মালাক (ফেরেশতা) যা বলেন তা আমি মুখস্ত করে নেই।**
আয়েশা (রা:) বলেন : **আমি প্রচন্ড শীতের দিনে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হতে এবং যখন তা শেষ হতো তখন তাঁর ললাট থেকে ঘাম দরদর করে পড়তে দেখেছি।** এমনকি তিঁনি উটের উপর সওয়ার থাকলে সেটি মাটিতে বসে পড়তো।

৫। ফেরেশতাকে তাঁর প্রকৃত চেহরায় দেখা : রাসূল (সা:) তাঁকে তাঁর সৃষ্টিগত চেহরায় দেখতে পেতেন। সে অবস্থায়ই ফেরেশতা আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর উপর ওহী নাযিল করতেন। তাঁর সাথে এরুপ দুবার হয়েছিলো। যেমনটা কোরআনের সূরা নাজমে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন।

৬। আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী : আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানের উপরে থেকে তাঁর উপর সরাসরি ওহী নাযিল করেন। যেমন মেরাজ রজনীতে নামায ফরজ হওয়া এবং অন্যান্য বিষয়ের ওহী নাযিল হওয়া।

৭। আল্লাহ তায়ালার সরাসরি রাসূল (সা:) এর সাথে কথা বলা : ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে কথা বলেছেন। যেমনভাবে মুসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন।

সর্বাগ্রে নাযিলকৃত আয়াতসমূহ : সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত তাঁর উপর সর্বপ্রথম নাযিল হয়।
যথা ঃ **১। পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। ২। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। ৩। পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু। ৪। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। ৫। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।**

দাওয়াত ও তাবলীগের স্তরসমূহ ঃ

১। নবুয়ত।
২। নিকটাত্মীয়দেকে সতর্কীকরণ।
৩। স্বীয় সম্প্রদায়কে ভীতিপ্রদর্শন।
৪। এমন সম্প্রদায়কে সজাগকরণ, যাদের কাছে তাঁর পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। তারা হচ্ছে সমগ্র আরববাসী।
৫। শেষ জামানা পর্যন্ত জ্বিন ও ইনসানদের মধ্য থেকে যাদের নিকট তাঁর দাওয়াত পৌছেছে, তাদের সকলকে সতর্ক হওয়ার ঘোষণা।

রাসূল (সাঃ) এর দাওয়াতের বিভিন্ন পর্যায় ঃ

১। গোপন দাওয়াত : গোপন দাওয়াত নবুওয়তের প্রথম তিন বছর চলমান থাকে।

২। প্রকাশ্য দাওয়াত : প্রকাশ্য দিবালোকে দাওয়াত দেওয়া তখনি আরম্ভ করেন, যখন তিঁনি এর জন্য আদিষ্ট হন। আল্লাহ তায়ালা বলেন : **অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয়।**

ঈমান আনয়নকারী প্রথম সারির ব্যক্তিবর্গ ঃ

১। পুরুষদের মাঝে : আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)।

২। নারীদের মাঝে : খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ)

৩। শিশুদের মাঝে : আলি বিন আবু তালিব (রাঃ)

৪। আযাদকৃত গোলামদের মাঝে : যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ)।

৫। দাস-দাসীদের মাঝে : বেলাল বিন রেবাহ হাবশী।

ইসলামের কতিপয় অগ্রপথিকগণ ঃ প্রথম সারির ঈমান আনয়নকারী যাদের নাম আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তাদের পরবর্তী পর্যায়ক্রমে ঈমান আনয়নকারীগণ হচ্ছেন :

১। উসমান বিন আফফান।

২। ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহ।

৩। যুবায়ের বিন আওয়াম।

৪। সাদ বিন আবু ওক্কাস।

৫। আব্দুর রহমান বিন আওফ।

৬। খব্বাদ বিন আরতি।

৭। সুহায়িব রুমি।

৮। আম্মার বিন ইয়াসির।

৯। তাঁর মা সুমাইয়া।

১০। আবু উবায়দা আমির বিন জাররাহ।

১১। উসমান বিন মাযউন।

১২। আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ।

১৩। উতবা বিন গাযওয়ান রাদিআল্লাহু আনহুম আজমাইন।

রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের মুশরিকদের কষ্টপ্রদান ঃ

মুশরিকদের নিকট যখন নবী (সা:) এর দাওয়াতের সততা ও তাঁর চতুর্পাশে বিপুলসংখ্যক মানুষের জনস্রোত গোচরীভূত হলো, তখন তারা রোষানলে তাদের উপর নিদারুণ আঘাত হানে। শোষণের কয়েকটি চিত্র নিম্মোক্ত অংকিত হলো।

১। মুশরিকদের রাসূল (সা:) এর সংস্রব থেকে মানুষদেরকে দূরে সরানোর এবং তাঁকে দেখে আতংকিত হওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মানুষদের নিকট জাদুকর হিসেবে গুজব ছড়িয়ে বেড়ানো।

২। সমাজে তাঁকে পাগল হিসেবে প্রচার করা, যাতে মানুষ তাকে নির্বোধ হিসেবে ডাকে।

৩। তাঁকে মিথ্যাবাদী হিসেবে উপস্থাপন। আর এটা নিতান্তই অমূলক ছিল, কারণ তিঁনি সত্যবাদীতা ও বিশিষ্ট আমানতদারিতার দরুন শত্রু-মিত্র সকলের নিকট আল-আমীন হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

৪। তাঁকে ও তাঁর আনীত বিধানকে ব্যাঙ্গাত্মক ঠাট্টা বিদ্রুপ করা।

৫। রাসূল (সাঃ) যখন জনসাধারণকে দীনের পথে আহবান করতেন, তখন মুশরিকরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আনীত সত্য তরিকাকে এবং ওহী শ্রবণ করা থেকে তাদেরকে বাধা প্রদান করার জন্য শোরগোল ও দাঙ্গা-মারামারি লাগিয়ে দিত।

৬। মক্কার বাহিরে দূর-দূরান্ত থেকে হজ্জ কিংবা ওমরা পালনের জন্য আগত সকলকে মুশরিক স্বাগতিকরা নবী (সা:) থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্কবার্তা শোনাতেন।

রাসূল (সা:) এর দেহ মোবারকে আঘাত হানা। এ ঘৃণ্যকর্ম ওকবা ইবনে আবু মুয়িত করেছিল। সে রাসূল (সা:) এর গলায় তার চাদর দিয়ে টেনে কন্ঠরুদ্ধ করে হত্যা করার চেষ্টা চালিয়েছিল, তখন আবু বকর (রা:) সময়মতো উপস্থিত হয়েছিলেন, না হলে এ দুর্বৃত্ত রাসূল (সা:) কে গলা টিপে হত্যাই করে ফেলেছিল। এবং এ লোকটিই নামায আদায়রত অবস্থায় রাসুল (সা:) এর পিঠে উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছিল। তাঁর কন্যা ফাতেমা (রা:) এসে সেই নাড়িভুঁড়ি দূরে ফেলেদেন। কোরাইশদের নেতৃত্বস্থানীয় ক'জন লোক তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে তাঁকে ইমারা বিন ওয়ালিদের বিনিমিয়ে তুলে নিয়ে হত্যার কুপ্রস্তাব পেশ করার মাধ্যমে হত্যার ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। তারা তাদের অন্তরে রাসূল (সাঃ) কে তাঁর হিজরত করার ইচ্ছা পোষণকালে হত্যার কুবাসনা ধারণ করেছিল। জীর্ণশীর্ণ মুমিনদেরকে অস্বাভাবিক সাজা প্রদান এবং ভীষণ কষ্ট দিয়েছিল। যেমনভাবে

তারা বেলাল (রা:) এর পেটের উপর ভারি পাথর চাপিয়ে দিতেন। তদ্রুপ নির্যাতন নিষ্পেষণ তারা আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা:) এর পরিবারসহ অন্যান্যদের সাথেও চালিয়ে ছিল।

আবসিনিয়ায় হিজরত ঃ মুসলমানদের সংখ্যা যখন জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে লাগলে, কাফেররা তা দেখে ভীত শংকিত হয়ে তাদের উপর নির্যাতনের এক্সট্রিম রোলার এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরো গুরুতর করলো। ফলে রাসূল (সা:) তাদেরকে হাবশায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করেন। এবং তিনি বললেন : **নিশ্চয় এ শহরের মালিকের কাছে মানুষেরা নিগৃহীত নয়।**

প্রথম দফা : এ দলে হিজরতকারী ছিলেন বারোজন পুরুষ এবং চারজন মহিলা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, উসমান বিন আফফান (রা:)। তিঁনিই সর্বপ্রথম দলনেতা হিসেবে বের হয়েছিলেন। হিজরত সঙ্গী হিসেবে তাঁর সাথে রাসূল (সা:) এর কন্যা রোকায়া ছিলেন। তাঁরা হাবশায় অত্যন্ত সুন্দর, মনোরম ও বন্ধুত্বপূর্ণ বাতাবরণে বসবাস করা শুরু করলেন। অতঃপর কিছুদিন পরে মুসলমানদের নিকট কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের খবর পৌছায়। কিন্তু সেই খবর নিছক অলীক ও বিকৃত ছিল। এ খবর পাওয়ার পর তাঁরা মক্কায় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে হাবশা ত্যাগ করেন। যখন তাদের নিকট বিষয়টি আরো অত্যন্ত নাযুক ও ঘোলাটে আকারে খবর পৌছায়, তখন তাদের মাঝ থেকে কেউ কেউ
হাবশায় ফিরে যায়। অন্যদিকে একটি দল মক্কায় প্রবেশ করেন। ফলে আবিসিনিয়া ফেরত মোহাজেররা তীর্যক সহিংসতার সম্মুখীন হন। মক্কায় প্রবেশকারীদের মধ্য আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদও ছিলেন।

দ্বিতীয় দফা : এ দফায় তিরাশি জন পুরুষ এবং আঠারো জন মহিলা হিজরত করেন। তাঁরা বাদশা নাজ্জাশীর নিকট অত্যন্ত ভাল অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। এ খবর কুরাইশদের কাছে পৌছালে তাদের অন্তর্জালা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তারা ক্রুদ্ধ হয়ে বাদশা নাজ্জাশীর নিকট আবিসিনিয়া হিজরতকারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য আমর ইবনে আস এবং গভীর বোধসম্পন্ন আব্দুল্লাহ ইবনে আবু রাবিয়াকে এক গুরুত্বপূর্ণ দূতিয়ালি মিশনে হাবশায় পাঠান। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে দিলেন।

হামযা ও ওমার (রা:) এর ইসলাম গ্রহণ : নবুওয়তের ষষ্ঠ বছরে হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা:) ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁকে কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যুবক হিসেবে অভিহিত করা হতো। আল্লাহর রাসূল (সা:) তাঁর মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করেছেন। নবী (সা:) এর দু'আর বরকতে ওমার বিন খাত্তাবও (রা:) ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। মুমিনরা উভয়ের মাধ্যমে সবল হলেন এবং কোরাইশদের অত্যাচার থেকে রেহাই পেলন।

শিয়াবে আবু ত্বালিব' গিরিসংকটে অন্তরীণাবস্থা : কোরাইশরা রাসূল (সা:) ও তাঁর পরিবারবর্গকে তিন বছর আবু তালেবের গিরি সংকটে অবরুদ্ধ করে অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করলো। সেই ঘাটিতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং কাফেররা রাসূল (সা:) এর পক্ষ থেকে ভীষণ কষ্ট পায়। আর এ অবরোধ থেকে রাসূল (সা:) বের হওয়ার সময় তাঁর উনপঞ্চাশ বছর বয়স ছিল।

আবু তালেবের ইন্তেকাল ঃ এর কয়েক বছর পরই রাসূল (সা:) এর চাচা আবু তালিব সাতাশি বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। তথাপি এর কিছু দিন পরেই খাদিজাতুল কোবরা (রা:) ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন কাফেরদের নিপিড়ন আরো মারাত্মক আকার রুপ ধারণ করলো।

তায়েফে যাত্রা : রাসূল (সা:) এবং যায়েদ বিন হারিসা (রা:) তায়েফের মাটিতে গিয়ে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে লাগলেন। এবং সেখানেই কিছুদিন অবস্থান করলেন। কিন্তু কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেননি। বরং তাকে কষ্ট দিয়ে নির্বাসন করলেন। এমনকি তারা তাঁকে কঙ্কর নিক্ষেপ করে দুপায়ের গোছা রক্তাক্ত করে দিল। তারপর তিঁনি সেখান থেকে প্রস্থান করে মক্কা নগরীর উদ্দেশ্যে ফিরে আসেন। অতঃপর মুতয়িম বিন আদির আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করে।

আদ্দাস নাসরানীর ইসলাম গ্রহণ : তায়েফ থেকে মক্কায় ফেরার পথে রাসূল (সাঃ) আদ্দাস নাসরানীর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করলেন। তিনি তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন এবং সত্যায়ন করলেন।

জিনদের ঈমান আনয়ন : পথিমধ্যে নাখলা নামক স্থানে নসিবায়িনবাসীদের সাতজন জিনের একটি দলকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করা হয়। অতঃপর তারা রাসূল (সা:) এর কাছে গিয়ে মনোযোগ সহকারে কুরআন শ্রবণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

নৈশভ্রমন ও উউর্ধ্বগমন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে স্বশরীর ও রুহ সহকারে বায়তুল মাক্বদিস পর্যন্ত নৈশ ভ্রমণ করানো হয়। এবং সাত আসমানের উপর দিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা:) কে স্বশরীর এবং রুহ সহকারে আল্লাহর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালে তাঁকে সম্মোধন করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেন।

বিভিন্ন গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত : নবী (সা:) যতদিন মক্কায় অবস্থান করতেন, ততদিন মক্কার বিভিন্ন গোত্রে দ্বারে দ্বারে গিয়ে আল্লাহর পথে আহবান করেছেন। তিঁনি প্রত্যেক মৌসুমে আশ্রয় চেয়ে নিজেকে তাদের সম্মুখে পেশ করেন, যাতেকরে সে তাঁর প্রতিপালকের রিসালাতের তাবলীগ করতে পারেন। এবং যারাই গ্রহণ করবে, তাদের জন্য রয়েছে অনন্ত সুখের আবাসস্থল জান্নাত। কিন্তু কোন গোত্রই তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিলেন না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সেই দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার সৌভাগ্যতা আনসারদের জন্য সম্মাননাস্বরুপ সঞ্চিত করে রাখলেন। তারপর তিঁনি ছয়জন বিশিষ্ট একটি দলের নিকট গেলেন। যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে মদীনায় ফিরে যায়। পরবর্তীতে তাঁরাও তাদের সম্প্রদায়কে ইসলামের পথে আহবান জানালেন। এমনকি ইসলামের গুঞ্জন তাদের সকলের রন্ধে রন্ধে ছড়িয়ে পড়লো এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর আলোচনা আনসারদের প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে প্রাতঃস্বরনীয় এবং নমস্য হয়ে উঠতে আর অবশিষ্ট রইল না।

আনসারগণ ও বায়য়াতে আক্বাবা (আনুগত্যের শপথ) :

আক্বাবাহর প্রথম বায়আত (আনুগত্যের শপথ) : আনাসারদের বারোজন লোক পরবর্তী বছর মক্কায় আগমন করলেন। তন্মধ্যে পাঁচজনই ছিলেন পূর্বের বছরে ইসলাম গ্রহণ করা ইয়াসরিবের ছয়জন যুবক। তাঁরা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এর কিছু কথার উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, যে কথাগুলো মক্কা বিজয়ের সময় মহিলাদের নিকট থেকে গৃহীত অঙ্গীকারনামার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আক্বাবাহর এ অঙ্গীকারনামার ঘটনা সুরা মুমতাহিনায় বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তারা মদিনায় ফিরে যায়।

আক্বাবাহর দ্বিতীয় শপথ : পরবর্তী বছর রাসূল (সা:) এর নিকট তাদের মধ্য থেকে সাতত্রিশ জন পুরুষ এবং দুজন মহিলা আগমন করলেন। তারাই সর্বশেষ আক্বাবার শপথ গ্রহণকারী। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাত ধরে এ কথার উপর শপথ গ্রহণ করলেন যে, তারা তাঁর ঐ সকল জিনিস থেকে হেফাযত করবে যে সকল জিনিস থেকে তারা আপন ছেলেমেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনদের হেফাজত করে থাকে। অঙ্গীকার পর্ব সম্পন্ন হলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকদের মধ্যে থেকে বারোজন নেতা নির্বাচন করলেন। অতঃপর তিঁনি এবং তাঁর সাহাবীরা উক্ত স্থান ত্যাগ করলেন।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ মাদানী যুগ ঃ

হিজরত করার অনুমতি প্রদান ঃ রাসূল (সা:) তাঁর সাহাবীদেরকে মদিনায় হিজরত করার অনুমতি প্রদান করলেন। ফলে তাঁরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে জড়সড় হয়ে গোপনে মদিনায় প্রবেশ করলেন। কথিত আছে, সর্বপ্রথম প্রবেশকারী ছিলেন : আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ মাখযুমী। এটাও কথিত আছে, সর্বপ্রথম প্রবেশকারী ছিলেন : মুসআব বিন উমায়ির। অতঃপর তারা সকলই আনসারদের গৃহে গৃহে প্রবেশ করলে তাঁরা তাদের থাকার জায়গা ব্যবস্থা এবং সাহায্য-সহযোগিতার হাত সম্প্রাসিত করে দিলেন। এতে করে মদীনার ওলিতে গলিতে ইসলামের সুমহান বানী ছড়িয়ে পড়লো। তারপর রাসূল (সা:) কে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হলে তিঁনি রবিউল আওয়াল মাসের রোজ সোমবার মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ছাপ্পান্ন বছর। সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এবং তাঁর আযাদকৃত গোলাম আমের বিন ফুহায়রা। আব্দুল্লাহ বিন আরীকাত লাইসী তাদের রাহবার ছিল। সে এবং আবু বকর (রাঃ) গারে সওর পৌঁছালেন। তাঁরা সেখানে তিন রাত্রি অবস্থান করলেন। অতঃপর তারা যাত্রার সাধারণ পথে না গিয়ে লোহিত সাগরের উপকূলের পথে যাত্রা করলেন।

রাসূল (সাঃ) এর মদীনা প্রবেশ ঃ রাসূল (সা:) এবং তাঁর সতীর্থরা মদীনায় পৌছালেন। সে দিনটি ছিল ১২ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার। তিঁনি মদিনার সর্বোচ্চস্থ ভুমি কুবা নামক স্থানে বনু আমর বিন আওফ গোত্রের নিকট অবতরণ করলেন। তিঁনি তাদের নিকট চৌদ্দদিন অবস্থান করলেন।

ইসলামের সর্বপ্রথম মাসজিদ ঃ রাসূল (সাঃ) মসজিদে কুবার ভিত্তিস্থাপন করেন। ইবনু ওমার (রাঃ) বলেছেন **: নবী (সা:) প্রতি শনিবার কুবা মসজিদে আসতেন, কখনো পদব্রজে, কখনো সওয়ারীতে। 'নবী (সা:) বলেন, কুবা মাসজিদে এক ওয়াক্ত সালাত পড়া একটি উমরার সমতুল্য।**

নবী (সাঃ) এর মসজিদে নববী নির্মাণ ঃ অতঃপর তিঁনি তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহন করে চলতে লাগলেন। বনু নাজ্জার গোত্রের লোকজনেরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিজ নিজ গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর নিকট আবেদন নিবেদন শুরু করতঃ উষ্ট্রীর লাগাম ধরে নিতে লাগলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

বলতেন **'উষ্ট্রীর পথ ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত রয়েছে"**। ফলে উটনী একটানা চলতে থাকল এবং বর্তমান মসজিদে নাবাবীর স্থানে যেয়ে বসে পড়ল। আর স্থানটি ছিল বনু নাজ্জার গোত্রের দু'জন অনাথ বালক সাহাল এবং সুহাইলের খেজুর শোকানোর কিংবা উট বেধে রাখার স্থান। অতঃপর তিঁনি তাঁর উষ্ট্রী থেকে নেমে আবূ আইউব আনসারীর বাড়ির সম্মুখে অবরতণ করলেন। অতঃপর তিঁনি ও তারঁ সাহাবীগণ খেজুর শোকানোর কিংবা উট বাধার স্থানটিতে মসজিদের নির্মাণ কাজ স্বহস্তে খেজুর গাছের ডাল ও ইট-পাথর দ্বারা শেষ করলেন। তারপর মাসজিদে নববীর সন্নিকটে তাঁর নিজের এবং পত্নীগণের জন্য বসতি স্থাপন করলেন। আয়েশা (রাঃ) এর ঘর মাসজিদের সব চেয়ে নিকটবর্তী ছিল। এ কক্ষগুলোর কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার সাত মাস পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ আইউব আনসারী (রাঃ)-এর বাসা থেকে নিজ আবাসস্থানে স্থানান্তরিত হন।

মুসলিমগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মাসজিদে নববী বির্মানের পর মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করলেন। এ সভায় সর্বশেষ নব্বই জন মুসলিম উপস্থিত ছিলেন। 'মুহাজির আনসার ভ্রাতৃত্বের' মূলনীতি গুলো ছিল, 'একে অন্যের দুঃখে দুঃখিত হবেন এবং মৃত্যুর পর নিজ আত্মীয়ের মতো একে অন্যের ওয়ারেস বা উত্তরাধিকারী হবেন। ওয়ারাসাত বা উত্তরাধিকারের এ ব্যবস্থা বদর যুদ্ধ পর্যন্ত চালু ছিল।

ইয়াহুদ : নবী (সা:) যখন মদীনায় আগমন করলেন, ইয়াহুদিরা নাবী (সা:) কে দেখে চিনতে পারলো যে, ইনিই হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত সত্য রাসূল (সা:)। এবং ইনিই সে মহান ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তারা নিজেদের কাছে রক্ষিত থাকা তাওরাতে লেখা দেখতে পায়। এতদাসত্ত্বেও তাদের মধ্যে থেকে অতি সামান্য সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্মে রুপান্তরিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে ধর্মীয় আলেম এবং যাজক আব্দুল্লাহ বিন সালাম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আর নবী (সা:) ইয়াহুহী গোত্রসমূহের সাথে সন্ধি করেছিলেন। সেই গোত্রগুলো হচ্ছে বানু ক্বায়নুক্বা, বানু নাযির এবং বানু কুরায়জা।

কেবলা পরিবর্তন : মেরাজে (উর্ধ্বগমনে) সলাতের বিধান ফরয হওয়ার পর নবী (সা:) বায়তুল মাক্বদিসের দিকে ক্বিবলামুখী হয়ে সলাত আদায় করতেন। আর তিনি মনে মনে কামনা করতেন, তাঁর কেবলা যেন কাবা ঘরের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর এ জন্যই তিঁনি বারংবার আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে তা প্রত্যাশা করছিলেন। তখন আল্লাহ তায়াল **এ আয়াত নাযিল করলেন : নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমরা আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন।** অতঃপর রাসূল (সাঃ) দ্বিতীয় হিজরীতে বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে ক্বাবা'হ গৃহকে ক্বিবলাহ বলে ঘোষণা করলেন এবং সলাতে ঐ দিক মুখ ফিরানোর নির্দেশ প্রদান করলেন।

যুদ্ধের অনুমতি প্রদান : নবী (সা:) মদিনা নববীতে শান্ত-শিষ্টভাবে বসবাসরত এবং তাঁকে আল্লাহর আনসার বাহীনিরা দুর্গের ন্যায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করার পর আল্লাহ নিন্মোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় : **যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ।** সুতরাং আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদেরকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে ঈমানদারকে যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করলেন। **রাসূল (সা:) এর প্রাথমিক যুদ্ধাভিযান :** গাযওয়াতুল আবওয়া, বুওয়াত, যিল উশায়রা এবং কিছু সংখ্যক অভিয়ান পরিচালনা করা।

গাযওয়ায়ে বদর ঃ আল্লাহর রাসূল (সা:) দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে তিন শতাধিক মুমিনদেরকে নিয়ে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী কোরাইশ কাফেলা অনুসন্ধানের তরে রওনা হন। অতঃপর আবু সুফিয়ান পুরো কাফেলাসহ বিপথগামী হলো এবং শয়তান কোরাইশকে প্রলুব্ধ করলো। ফলে তারা মুমিনদের সাথে লড়াই করার জন্য বের হয়ে গেল। উভয় দল মোকাবেলা করার জন্য মিলনস্থল বদর প্রান্তরে সম্মিলিত হলো। এটাই ছিল গাযওয়ায়ে বদর, যাকে ইসলামের প্রথম হক্ব-বাতিলের নির্ণয়কারী যুদ্ধ অভিধায় আভিহিত করা হয়। যখন দু'দলের সৈন্যরা লড়ায়ের জন্য একত্রিত, রাসুল (সাঃ) তখন স্বীয় প্রতিপালকের নিকট অনুনয়-বিনয়াবনত হয়ে ফরিয়াদ করতে লাগলেন। ফলে আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের ময়দানে ফেরেশতা প্রেরণের মাধ্যমে শক্তিশালী করলেন। স্বয়ং ফেরেশতারা এ যুদ্ধে মুসলিমদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী এবং তাঁর নিনাদকে বুলন্দ করলেন। এ যুদ্ধে বদর প্রান্তরে সত্তরজন মুশরিক সৈন্যবাহিনী নিহিত হয়। এবং চৌদ্দজন মুসলিম শহীদি মৃত্যু বরণ করেন।

গাযওয়ায়ে ক্বায়নুক্বা ঃ বনু ক্বায়নুক্বা গোত্রের লোকেরা মুসলমানের সাথে আবদ্ধ সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করলে রাসূল (সা:) তাদেরকে ১৫ দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ করে রাখলেন। ফলশ্রুতিতে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রাসূল (সাঃ) এর হুকুম মেনে নেওয়ার জবানবন্দি দেয়। তখন রাসূল (সাঃ) তাদের উপর থেকে অবরোধ পরওয়ানা উঠিয়ে নেন। এবং তারা সংখ্যায় ৭০০ জন ছিল।

উহুদ যুদ্ধ ঃ শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কোরাইশরা বদরের যুদ্ধে তাদের পরাজয় ও অপমানের যে গ্লানি এবং তাদের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের হত্যার যে একরাশ দুঃখভার বহন করতে হয়েছিল তারই কারণে তারা মুসলিমগণের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার অনলে দগ্ধীভূত হয়ে প্রায় তিন হাজার মর্ত্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পরে। রাসূল (সাঃ) উহুদ

প্রান্তরের উদ্দেশ্যে তাঁর সাতশোজন সাহাবীদেরকে নিয়ে রওয়ানা করে। সে সময় মুনাফিকরা তাঁর থেকে নিরাশ হয়ে পশ্চাৎপসারণ করেছিল। দিনের প্রাতঃকালে আক্রমণের দাপট ছিল মুসলমানদের হাতে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদেরকে নিদারুণ পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। ফলে মুসলমানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ মুশরিকদের হস্তগত হয়। এমনকি তারা রাসূল (রাঃ) এর নিকটে এসে তাঁর উপর আঘাত হানলেন এবং দন্ত মোবারাক ভেঙ্গে শহীদ করে ফেললেন। রাসূল (সাঃ) এর সাথে সেদিন ফেরেশতারাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবী শহিদ হন। তন্মধ্যে হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব, মুসআব বিন উমাইর, আনাস বিন নযর এবং হানযালা আল-গাসিল (ফেরেশতাগণ কর্তৃক বিধৌত) প্রমুখ সাহাবীগন। এবং এ যুদ্ধে ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সাধন করে উত্তম আঘাতে বিপদাপন্ন হন। এমনকি তাঁর ব্যাপারে রাসূল (সা:) বললেন : ত্বালহাহ (জান্নাত) ওয়াজিব করে নিয়েছে। রাসূল (সা:) ও মুসলিমরা পাহাড়ে আরোহন করে জোটাবদ্ধ হলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে মুশরিকদের করাল থাবা থেকে রক্ষা করলেন। উহুদ দিবসটি ছিল বালা-মুসিবত ও মুমিনদেরকে পাক-সাফ করার দিবস। আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। এবং তিঁনি মোনাফেকদের প্রকৃত মুখোশ উন্মোচন করেছেন। এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে মুমিনদেরকে শাহাদাৎ এর পেয়ালা পান করান। কোরাইশরা এ যুদ্ধের পর মুসলমানদেরকে সমূলে নিধন করার জন্য আরেক দফা বের হওয়ার সংবাদ রাসূল (সাঃ) এর শ্রুতিগোচর হয়েছিল। অতঃপর সেদিন মুমিনরা ক্ষত-বিক্ষত ও আঘাতগ্রস্ত হয়ে আক্রান্তস্থান থেকে বের হয়ে যায়। আর যখন মুসলমানদের হামরাউল আসাদে অবতরণ করার সংবাদ কুরাইশদের কর্ণগোচর হয়, তখন তারা নিরাশ হয়ে মক্কায় পশ্চাৎগমন করে।

হিজরীর চতুর্থ বর্ষ ঃ হিজরীর ৪র্থ বর্ষে বীরে মাউনার ঘটনাটি ঘটে। যেখানে কুরআনের সত্তরজন পাখি তথা সাহাবীকে হত্যা করা হয়েছে। এ বর্ষেই গাযওয়ায়ে নাযির সংঘটিত হয় যাতে নবী (সাঃ) ইয়াহুদিদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। এমনকি আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃদয়ে রাসূল (সাঃ) এর ভয়-ভীতি প্রক্ষেপণ করেন। এবং নবী (সাঃ) তাদেরকে মদীনা থেকে উচ্ছেদ করে দিলেন। তাদের ব্যাপারে সূরা হাশর নাযিল হয়ে যায়।

গাযওয়ায়ে মুরাইসি ঃ হিজরীর ৬ষ্ঠ বর্ষে নবী (সাঃ) বনু মোসত্বালাক গোত্রের মোনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পরলেন। অবশেষে বিজয় বেশে ফিরে এলেন। পথিমধ্যে তায়াম্মুমের বিধান প্রণীত হয়। এ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আয়েশা (রাঃ) এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনার

ঘটনাটি ঘটে। মোনাফিক্বরা উম্মুল মুমিনিন কে তহমতের কালি মাখান। কিন্তু তিনি ছিলেন পূত-পবিত্র ও নির্মলকৃত। এ বিষয়টি রাসূল (সাঃ) ও তাঁর উপর জগদ্দল পাথরের ন্যায় অত্যন্ত ভারী হয়ে গেলে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্দোষিতার ঘোষণার কথা সূরা নুরে নাযিল করলেন। এবং জবাবে অপবাদ রটনাকারীরা পেল বেত্রাঘাতের শাস্তি।

গাযওয়াবে আহযাব ঃ হিজরীর ৫ম বছর শাওয়াল মাসে পরিখা খননের (আহযাব) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যখন ইয়াহুদিরা নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য কোরাইশ ও তাদের মিত্রদের সাথে আতাঁত করে কোরাইশ, বনু সুলাইম, বনু আসাদ, ফাযারা এবং আশজাহ প্রভৃতি গোত্র থেকে ১০ হাজার সৈন্যবাহিনী জমায়েত হয়ে মদিনার পথে ছুটে আসলো। এদিকে নবী (সা:) কে শলা পরামর্শ সভায় সালমান ফারসী (রাঃ) আত্নরক্ষামূলক পরিখা খননের হেকমতপূর্ণ পরামর্শ দিলেন। শত্রুপক্ষের সঙ্গে মোকাবেলার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তিন হাজার সৈন্য বিশিষ্ট এক বাহিনীসহ অগ্রসর হলেন এবং সালা পর্বতকে পিছনে রেখে শিবির স্থাপন করলেন, সম্মুখভাগে ছিল খন্দক যা মুসলিম এবং কাফিরদের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক প্রাচীর হিসেবে বিদ্যমান ছিল। তিঁনি হুলাফাদের তথা (মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ) বনু কুরায়যা গোত্রের নিকট নিরাপত্তার অনুরোধ করা মাত্রই তারা (যুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করার) অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো তথাপি শত্রুবাহিনীদেরকে সমর্থন করলো। তখন রাসূল (সাঃ) তাদের এবং শত্রুবাহিনীদের কাছে নুয়াইম বিন মাসউদ (রাঃ) কে কূটকৌশল অবলম্বন এবং তাদের মনোবলে ত্রাস এবং অরাজকতা বিরাজ করে দেওয়ার জন্য পাঠালেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর উত্তপ্ত বায়ুর তুফান প্রেরণ করেন। যা তাদের তাঁবু উপড়িয়ে দেয়, মৃত পাত্রসমূহ উলটিয়ে দেয়, তাঁবুর খুঁটিসমূহ উৎপাটন করে ফেলে এবং সব কিছুকে তছনছ করে ফেলে। এর সঙ্গে প্রেরণ করেন ফিরিশতা বাহিনী যাঁরা তাদের অবস্থানকে নড়চড় করে দেন এবং অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করেন। ফলে সেখান থেকে তারা প্রস্থান করে। প্রভাতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যক্ষ করেন যে, তাদের প্রত্যাবর্তনের ফলে ময়দান একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। কূটষড়যন্ত্র ও কুচক্রীপানার কোন প্রকার সাফল্য লাভ ছাড়াই তারা স্থানচ্যুত হয়েছে।রাসূল (সাঃ) বনু কুরাযায় গিয়ে সাদ বিন মুয়ায (রাঃ) কে গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত করলেন। এ যুদ্ধে সূরা আহযাব অবতীর্ণ হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি ঃ নবী (সাঃ) হিজরীর ৬ষ্ঠ সনে চৌদ্দশত সাহাবাবৃন্দকে নিয়ে (মক্কার অভিমুখে) ওমরা পালনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। অতঃপর নবী (সাঃ) যখন হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌছালেন মক্কার কোরাইশরা তাঁকে মক্কা-প্রবেশে নিরস্ত করলো। এবং তিঁনি তাদের সাথে এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে, আগামী ১০ বছর শত্রুপক্ষ অস্ত্র অর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধের দামামা চলতে থাকবে। প্রকাশ থাকে যে, এ সন্ধিচুক্তি মুমিনদের জন্য ছিল বিরাট মক্কা বিজয়ের চাবি কাঠি। যেমন

আল্লাহ তায়ালা বলেন : **নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট।** হুদায়বিয়া সন্ধিচুক্তির লব্ধকথা হচ্ছে : কোরাইশরা আগন্তুক বছরে মুমিনদেরকে নির্বিঘ্নে ওমরা আদায় করার জন্য মক্কায় প্রবেশকালে বদান্যতা প্রদর্শন করবে। অবশেষে, হিজরীর ৭ম বর্ষে যুল কাদ মাসে "ওমরাতুল ক্বাযা" পালিত হয়।

গাযওয়ায়ে খায়বার ঃ রাসূল (সাঃ) হুদায়বিয়া নামক স্থান থেকে প্রত্যাগমনের প্রায় ২০ দিন পর মদিনার উত্তর দিকে অবস্থিত খায়বার এর উদ্দেশ্যে বের হয়ে সেখানে ইয়াহুদিদেরকে প্রায় ২০ দিন যাবৎ সর্বাঙ্গীণভাবে অবরুদ্ধ করলেন। মুসলমানরা তদস্থলে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করেছিলেন । অবশেষে, ইয়াহুদিদের মনে নিশ্চিত ধ্বংসোম্মুখে পতিত হওয়ার স্থির বিশ্বাস জাগরিত হলে, রাসূল (সা:) এর নিকট যুদ্ধবিরতির দরখাস্ত করলেন। এতে রাসূল (সাঃ) রাজি হলেন। তিঁনি তাদেও সাথে এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে, তাদের জীবন রক্ষা করা হবে এবং শুধুমাত্র গায়ে পরিহিত বস্ত্রসহ খায়বার থেকে বের হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে। অতঃপর তিঁনি ইয়াহুদিদেরকে তাদের জমি এ শর্তে দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে কৃষি কাজ করে ফসল উৎপাদন করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তাদের প্রাপ্য হবে।

জাফর বিন আবু তালিবের শুভাগমন ঃ নবী (সাঃ) খায়বারে থাকাকালীন আবু হুরায়রা (রাঃ) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মদিনায় প্রবেশ করলেন। তদ্রুপ হাবশা ফেরৎ রাসূল (সাঃ) এর চাচা জাফর বিন আবু তালিব ও তাঁর সঙ্গীগণও খায়বারে রাসূল (সাঃ) এর খিদমতে সমাগত হলেন। আশয়ারী মুসলিমগণ অর্থাৎ আবূ মুসা (রাঃ) এবং তাঁর বন্ধুগণ (রাঃ) সেদিনও উপস্থিত হয়েছিলেন।

মূতার যুদ্ধ ঃ হিজরীর ৮ম বছর মূতা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রোম সম্রাটের গভর্নর শোরাহবিল বিন আমর আল-গাসসানি রাসূল (সাঃ) কর্তৃক রোম সম্রাটের নিকট পত্রসহ প্রেরিত দূতকে বেদম প্রহার করে হত্যা করে। যার ফলে রাসূল (সাঃ) তাঁর পরম বন্ধু যায়দ বিন হারিসা (রা;) কে আমির বানিয়ে তিন হাজার সাহাবীর একটি বাহিনী গঠন করে রোম অভিমুখে প্রেরণ করেন। এবং যাত্রাপথে বলেন : **যায়দ (রাঃ) শাহাদাত লাভ করলে জা'ফর (রাঃ) লোকদের আমির হবে। জাফর (রাঃ) শাহাদাতের লাভ করলে আব্দুল্ললাহ বিন রওয়াহা লোকদের আমির হবে।** অন্যদিকে হিরাক্বল ও তাঁর আরবীয় অনুচরবর্গ দুলক্ষ্য সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রা করে। অতঃপর উভয় দল মুতা নামক স্থানে মুখোমুখি হয়ে একে অপরের সাথে রক্তের ঝনঝনানিতে মেতে উঠে। রাসূল (সাঃ) এর সকল সৈন্য পরিচালকগণ শাহাদাত বরণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অবশেষে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) পতাকা ধারণ করলেন। এবং তিঁনি সুচারুভাবে সৈন্যদল পরিচালনা করতঃ মুসলিমদেরকে পশ্চাদপসরণ করাতে সক্ষম হলেন। যুদ্ধের সমাপনান্তে তিঁনি মুসলমানদেরকে আল্লাহ ও তাদের শত্রুদের হাত থেকে (আল্লাহর সাহায্য) নিষ্কৃতি দান করলেন।

বিরাট মক্কা বিজয় ঃ প্রাগুক্ত বছর অর্থাৎ হিজরীর ৮ম বছর কোরাইশদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ বনু বাকর গোত্রের লোকেরা নবী (সাঃ) এর সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ বনু খুযায়া গোত্রের লোকদের উপর আকস্মিক আক্রমণ করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করে বসে এবং কোরাইশরাও বনু বাকর গোত্রের লোকদেরকে অন্দরমহলে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করে। এ সংবাদটি রাসূল (সাঃ) অবধি পৌঁছুলে তিঁনি মক্কা নগরী বিজয় করার উপর দৃঢ়তর ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আর আবু সুফিয়ান মদীনায় এসে রাসূল (সাঃ) এর সাথে কথা বলার অনেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা করার পরও ব্যর্থ হলো। তিঁনি তাঁর কোন কথাই কর্ণপাত করলেন না। আবু বকর, ওমার ও আলী (রাঃ) দেরকে রাসূল (সাঃ) যাতে তার সাথে কথা বলে, এ বিষয়ে তাঁর নিকট সুপারিশ করার আহবান জানালেও তাঁরা তাকে অস্বীকৃতি জানিয়ে দেয়। প্রকারন্তরে, নবী (সাঃ) কায়মনোবাক্যে আল্লাহর নিকট কোরাইশদের কাছে রাসূল (সাঃ) এর মক্কা অভিমুখে যাত্রার বিষয়টি গোপন ও দৃষ্টিহীন রাখার জন্য দুয়া করলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দুয়ার ডাকে সাড়া দিলেন। অতএব তারা রাসূল (সাঃ) এর আগমনের কোন বার্তা পেলেন না। এদিকে রাসূল (সাঃ) দশ হাজার সাহাবীদেরকে নিয়ে রওয়ানা হয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। পথিমধ্যে রাসূল (সাঃ) এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুক্ষন পূর্বেই ইসলাম গ্রহন করেন। রাসূল (সাঃ) মক্কা বিজয়কালে বলেছিলেন **: যে ব্যক্তি আবূ সুফইয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে আশ্রিত হবে এবং যে নিজ ঘরের দরজা ভিতর হতে বন্ধ করে নেবে সে আশ্রিত হবে এবং যে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে সেও আশ্রিত হবে**। সেদিন রাসূল (সাঃ) যুদ্ধ করেন নি বললেই চলে, তবে তিঁনি খুব কমসংখ্যক তাঁর এবং মুসলিমদের বিদ্ধকারী এবং যুদ্ধের জন্য অকস্মাৎ ঔদ্ধত্য জাহিরকারীদেরকে কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন। রাসূল (সা:) মক্কায় প্রবেশ করে ইহরাম না বাধা অবস্থায় কাবা ঘর তওয়াফ করেন তাওয়াফ সম্পন্ন করার পর উসমান বিন ত্বালহাহ (রাঃ)-কে ডেকে নিয়ে তাঁর কাছ থেকে কা'বা ঘরের চাবি গ্রহণ করেন। অতঃপর তিঁনি কাবা ঘরের অভ্যন্তরস্থিত এবং তাঁর চতুর্পাশে থাকা মূর্তি-প্রতিমাগুলোকে ভেঙ্গে চৌচির করে দিলেন। অতঃপর উসমান বিন ত্বালহাকে চাবি ফেরত দিয়ে দিলেন। মক্কা বিজয়ের পরবর্তীকালে বহুসংখ্যক মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অধিকন্তু, বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা প্রতিনিধির আকারে ইসলামের দাওয়াত কবুল করতঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে সমাগত হওয়ার হিড়িক পড়ে যায়।

প্রতিমা ভাঙ্গন ঃ আল্লাহ তায়ালা নবী (সাঃ) কে মক্কা বিজয় দান করার পর নবী করিম (সাঃ) তাঁর সাহাবাবৃন্দকে মক্কার চতুর্পাশে অবস্থিত প্রতিমাগুলোকে ভেঙ্গে চৌচির করে দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। আমর বিন আস (রাঃ) কে "সুয়া", সাদ বিন যায়েদ (রাঃ) কে "মানাত", খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) কে "উজ্জা", তুফাইল (রাঃ) কে "যিল কাফফাইন", এবং আলী (রাঃ) "তায় মূতি", ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য পাঠালেন।

হুনায়েন যুদ্ধ ঃ হাওয়াযেন গোত্রের লোকদের কর্ণকুহরে মুলমানদের ঈর্ষনীয় মক্কা বিজয়ের সংবাদ পৌছা মাত্রই তারা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার জন্য রাসূল (সাঃ) এর উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সিন্ধান্তে উপনীত হয় । তারা সম্পদাদি, গবাদি, বিবিগণ ও শিশু সন্তানদেরকেও সঙ্গে করে যাত্রা করলেন। অপরপক্ষে, নাবী কারীম (সাঃ)- বার হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে তাদের উদ্দেশ্য অগ্রসর হলেন। মুসলিমদেরকে তাদের সংখ্যাধিক্যতা প্রফুল্ল করে তুলেছিল। এভাবে তারা হুনায়েন উপত্যকায় উপস্থিত হন। হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের উপর আকস্মিক আক্রমণ চালায়। আকস্মিক এ আক্রমণের প্রচন্ডতা সামলাতে না পেরে থতমত খেয়ে মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ অবস্থায় নবী (সাঃ) থেকে দৌঁড়াদৌঁড়ি করতে থাকল। কিন্তু নবী (সাঃ) এর সাথে থাকা এক দল মুহাজিরগণ ও তাঁর পরিবার-পরিজনেরা দৃঢ়চিত্তে অনঢ় থাকলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে দৃঢ়পদ করলেন ফলে তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর দিকে প্রত্যাবর্তন করতঃ যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়লেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদেরকে শত্রুদের উপর বিজয়ী করলেন। আর হাওয়াযেন গোত্র পরাজিত হওয়ার পর ত্বায়িফ অভিমুখে পালিয়ে যায়। উক্ত গোত্রের চৌদ্দজন পুরুষ ইসলাম গ্রহণান্তে নবী (সাঃ) এর নিকট আগমন করলেন। তারা রাসূল (সাঃ) কে বন্দীদের উপর অনুগ্রহ করার আরজ করলে, তিনি তাদের প্রতি হলেন দয়াপরবশ এবং তারাও তাঁর প্রতি হলো দয়াদ্র।

ত্বায়িফ যুদ্ধ ঃ নবী (সাঃ) হাওয়াযেন গোত্রের কার্যাদি থেকে বিরাম পাওয়ার পরপরই ত্বায়িফ যুদ্ধের জন্য মনস্থির করলেন। তদনুপাতে তিঁনি ত্বায়িফে গিয়ে পৌঁছালেন এবং ত্বায়িফ দূর্গের নিকটবর্তী স্থানে শিবির স্থাপন করে ১৮ দিন যাবৎ দূর্গ অবরোধ করে রাখলেন।অতঃপর তিঁনি কোন সংঘর্ষের মুখোমুখি না হয়েই ফিরে আসলেন

তাবুক যুদ্ধ ঃ হিজরীর নবম সনে তাবুক যুদ্ধ (অসচ্ছলতার যুদ্ধ) সংঘটিত হয়। সময়টা ছিল অত্যন্ত গরম। এবং ফলমূল সংগ্রহ ও ছায়ার জন্য বাগ-বাগিচায় অবস্থান করার মৌসুম। ফলে যুদ্ধের জন্য লোকদের পক্ষে বের হওয়াটা অত্যন্ত জটিল ও সঙ্গীন হয়ে ওঠে। নবী (সাঃ) যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা পোষণকালে লোকদেরকে আল্লাহর রাহে দান-দক্ষিণা করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। ফলশ্রুতিতে ওসমান (রাঃ) পালান ও গদিসহ তিনশত উট দান করলেন। সাথে এক হাজার (আনুমানিক সাড়ে পাঁচ কেজি ওজনের) স্বর্ণমুদ্রা। রাসূল (সাঃ) এ দৃশ্য দেখে বললেন : **(আজকের পর উসমান যা কিছু করবে তাতে তার কোনই ক্ষতি হবে না।)** এবং অন্যান্য সাহাবীরা সাধ্যানুপাতে দান-খয়রাত করলেন। সেদিন আপামর মোনাফেকরা সদকা প্রদানে পশ্চাৎপদ হয়েছিল। এ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) এর শীর্ষস্থানীয় তিনজন সাহাবী কোন প্রকার ওজর ছাড়াই পশ্চাদ্মুখী হয়েছিলেন। তারা হলেন যথাক্রমে :

১। কাব বিন মালেক,

২। হেলাল বিন উমায়্যা।
৩। মুরারা বিন রাবি।
নবী (সাঃ) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে পূর্বোল্লিখিত সাহাবীগণ তাঁর কৈফিয়ত দিলে তাদের ব্যাপারে সূরা তওবার আয়াত নাযিল হয়। **(অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল)**। অতঃপর তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা তাদের সত্যবাদিতা অবগত হয়ে দয়াপরবশ হন। এবং তিঁনি প্রাগুক্ত সূরাতে কপটাচারীদেরকে বীভৎসভাবে ভৎসনা করেন। এবং তাদের অন্তরে সীল মোহর মেরে দিয়েছিলেন। ফলে এ সূরাটিকে গোমর ফাসকারী অভিধায় নামকরণ করা হয়। কেননা এ সূরার সারবস্তু তাদের যবনিকা উন্মোচন করে দিয়েছিল। এ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) আয়লার প্রশাসকের সাথে ভূমিকর গ্রহণের শর্তে চুক্তি সম্পাদন করেন। তদ্রূপভাবে জারবা এবং আজরুহর অধিবাসীগণের সাথেও খাজনা গ্রহণের ব্যাপারে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের লিখিত প্রমাণ প্রত্র প্রদান করেন যা তাদের নিকট সংরক্ষিত ছিল। নবী (সাঃ) দুমাতুল জান্দালের শাসক উকায়দেরের সাথেও সন্ধি করেছিলেন। এ যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) তাবুক প্রান্তরে ১০ দিন এর অধিক সময় অবস্থান করেছিলেন। অবশেষে তিঁনি কোন সংঘাতের সম্মুখীন না হয়ে অক্ষত অবস্থায় মদিনায় ফিরে আসলেন। আল্লাহর নবী যখন মদিনায় ফিরে আসলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে মোনাফিকদের নির্মিত মাসজিদে জিরারকে বিধ্বস্ত করার আদেশ প্রদান করেন। আল্লাহ তায়ালার বাণী : **(আর যারা নির্মাণ করেছে মসজিদ, জিদের বশে এবং কুফরীর তাড়নায় মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ঐ লোকের জন্য ঘাটি স্বরূপ যে পূর্ব থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আসছে,)**। সুতরাং তিঁনি "মাসজিদে জিরার" একেবারে উপড়ে ফেললেন। তাবুকের অভিযান ছিল তাঁর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধাভিযান যাতে স্বশরীরে তিঁনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিনিধি দলসমূহ ঃ তাবুক যুদ্ধের পর সাক্বীফ গোত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এবং নবম বর্ষকে "প্রতিনিধি দলসমূহ আগমনের" বর্ষ নামে আখ্যায়িত করা হয়। অতঃপর রাসূল (সাঃ) এর নিকট বিভিন্ন গোত্র প্রতিনিধির আকারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে উপর্যুপরিভাবে আসা-যাওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। তন্মধ্যে বনু তামিম গোত্রের প্রতিনিধি দল ও তাদের সর্দার : আতারিদ বিন হাজেব আত-তামিমি, ত্বায় গোত্রের প্রতিনিধি দল ও তাদের দলপতি : যায়েদ আল-খায়েল, আবদুল ক্বায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল ও তাদের অগ্রদূত : আল-জারুদ আল-আবদী। বনু হানীফার গোত্রের প্রতিনিধি দল এবং তাদের অভ্যন্তরে মুসায়লামাতুল কাজ্জাব ছিল। যে পরবর্তী সময়ে নবুওয়াতের দাবী করে বসে।

আবূ বাকর (রাঃ)-এর হজ্জ পালন ঃ হিজরীর নবম বর্ষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মানবজাতির জন্য মানাসিকে হজ্জ (হজ্জের বিধি বিধান) কায়েম করার উদ্দেশ্যে আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে আমিরুল হজ্জ (হজ্জযাত্রী দলের নেতা) হিসেবে প্রেরণ করেন। রাসূল (সাঃ) আলী (রা:) কে জনতার মাঝে সূরা তওবার প্রথমাংশ পাঠ করার জন্য এবং মুশরিকদের সাথে সকল অঙ্গীকার বিলুপ্ত

ঘোষণা করার জন্য পাঠালেন। আবূ বাকর (রাঃ) জনসম্মুখে ঘোষণা প্রদান করেন যে, আগামীতে কোন মুশরিক খানায়ে কা'বাহর হজ্জ করতে পারবে না এবং জাহেলীদের মত কোন উলঙ্গ ব্যক্তি কা'বাহ ঘর তাওয়াফ করতে পারবে না।

বিদায় হজ্জ ঃ রাসূল (সাঃ) হিজরীর দশম বর্ষে বিদায়ী হজ্জ পালন করেন। তখন বিবিধ গোত্র-উপগোত্র ও দেশ-বিদেশ থেকে আগত মুসলিম যাদের সংখ্যা লক্ষাধিক পর্যন্ত পৌছেছিল তাঁরা রাসূল (সাঃ) এর সাথে হজ্জ পালনের এ মোক্ষম সুযোগকে গ্রহণ করতঃ অগ্রসর হলেন। রাসূল (সাঃ) (হজ্জ পালনকালে) তাঁদেরকে মানাসিকে হজ্জ (হজ্জের বিধি বিধান) শেখালেন। তিঁনি আরাফা দিবসে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা এ-ই আয়াতটি পাঠ করলেন : **আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।** এবং তিঁনি তাদেরকে দ্বীন-ইসলাম শতভাগ নিশ্চিতরূপে সম্পূর্ণ হওয়ার সংবাদ দিলেন। কুরআন এবং সুন্নাহর আনীত জীবনব্যবস্থাকে দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরার জন্য ওসিয়াত করলেন। আরো সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জান, মাল ও তাদের ইয্যত-আবরুকে তাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত করে দিয়েছেন। সুতরাং এটাই রাসূল (সাঃ) এর বিদায়ী ভাষণে পর্যবসিত হয়।

উসামা (রাঃ) কে সামরিক অভিযানে প্রেরণ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ১১ হিজরীর সফর মাসে রুমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এক বিশাল সেনাবাহিনী প্রস্তুত করলেন এবং উসামা বিন যায়দকে (রাঃ) সে দলের গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত করলেন। অতপর তিঁনি অগ্রযাত্রা করে জুর্ফ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। পরিশেষে, তাদের নিকট রাসূল (সাঃ) এর অসুস্থতার সংবাদ পৌছায়।

রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধ-বিগ্রহের সার-সংক্ষেপ ঃ

রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধ, সামরিক অভিযান ও সারিয়্যাসমূহ

কুরআনুল কারীমে অবতীর্ণ রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধ-বিগ্রহ আদ্যপান্ত

রাসূল (সাঃ) এর সমুদয় যুদ্ধ, সামরিক অভিযান ও সারিয়্যা হিজরতের পরবর্তী ১০ বছর সময়কালের মধ্যেই সংঘটিত হয়। আর সারিয়্যা ও সামরিক অভিযানসমূহের সংখ্যা ছিল ৬০ ছুই ছুই। পক্ষান্তরে, ২৭ টি যুদ্ধাভিযান। তন্মধ্যে ৯টি যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেন। সেগুলো নিম্নোদ্ধৃত হলো : ১। বদর যুদ্ধ। ২। উহুদ যুদ্ধ। ৩। খানদাক্ব। ৪। কুরায়যা। ৫। মুসত্বালিক। ৬। খায়বার ৭। মক্কা বিজয় ৮। হুনাইন। ৯। ত্বায়িফ। আর কুরআনুল কারীমে পূর্বোদ্ধি কতক যুদ্ধসমূহের কিয়দাংশ আলোচনা অবতীর্ণ হয়েছে। যা নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

বদর যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরাহ আনফাল অবতীর্ণ হয়। এ সূরাটি বদর অভিধায় অভিহিত করা হয়।

উহুদ যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সূরা আলে ইমরানের শেষাংশের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। এই আয়াত থেকে (আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন,) সূরার শেষাংশের সামান্য কতক আয়াত পূর্ব-পর্যন্ত।

খানদাক্ব, বনু কুরায়যা ও খায়বার যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আহযাবের সদরস্থ অবতীর্ণ হয়েছে।

বনু নাযির গোত্রের যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরাহ হাশর অবতীর্ণ হয়েছে।

হুদায়বিয়া ও খায়বার যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা ফাতহ অবতীর্ণ হয়েছে। উক্ত সূরায় মক্কা বিজয়ের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এবং সূরা নাসরে পরিস্ফুটভাবে বিধৃত হয়েছে।

তাবুক যুদ্ধ : এ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা তওবার কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

রাসূল (সাঃ) শুধুমাত্র একটি যুদ্ধ তথা উহুদ যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন। ফিরিশতাগণ তাঁর (সাঃ) সাথে উপর্যুক্ত যুদ্ধাভিযান থেকে বদর, উহুদ এবং হুনাইন যুদ্ধে একসাথে

লড়াই করেছেন। আর খানদ্বাক্ব যুদ্ধে ফিরিশতাগণ অবতরণ করে মুশরিকদেরকে প্রকম্পিত ও পর্যদুস্ত করেন।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বদর যুদ্ধে এক মুষ্টি পাথুরে মাটি নিয়ে মুশকরিকদের চেহরায় নিক্ষেপ করলে তৎক্ষনাৎ তারা বিকৃত চেহরা নিয়ে পলায়ন করে। মুসলমানদের দুটি যুদ্ধে স্পষ্ট বিজয় অর্জিত হয় ঃ ১। বদর। ২। হুনাইন।

রাসূলে কারীম (সাঃ) উপরিউক্ত কোন এক যুদ্ধে তথা ত্বায়িফের যুদ্ধে মিনজানিক যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে একাধিক গোলা নিক্ষেপ করতঃ সংগ্রাম করেছেন। তিঁনি পরিখা খনন করে কোন এক যুদ্ধে তথা আহযাব যুদ্ধে নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছন। সালমান ফারেসী (রাঃ) তাঁকে উক্ত পরিখা খননের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

পরিশেষে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়নবী (সাঃ)-কে দুনিয়ায় মোহ-ভালবাসা এবং তাঁর সাক্ষাৎকারে সৌভাগ্যশালী হয়ে জান্নাত প্রাপ্তি, এ দুয়ের মাঝে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার দিলে তিঁনি তাঁর সাক্ষাৎকার ও জান্নাত লাভকে নিজের জন্য বেছে নিলেন। ফলে তিঁনি কঠিম প্রাণঘাতী রোগে আক্রান্ত হলেন। মরণোন্মুখ পরিস্থিতে সেবাশুশ্রূষা গ্রহণের জন্য পত্নীগণের কাছে আয়েশা (রাঃ) এর গৃহে অবস্থান করার অনুমতি চাহিবা মাত্র সকলই অনুমতি দিয়ে দিলেন। তিঁনি অসুস্থতার দরুন মাসজিদে জামাতে নামাজ পড়তে অপারগ হলে আবু বকর (রাঃ) কে লোকদের ঈমামতি করার নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশ রাসূল (সাঃ) এর তিরোধানের পর খেলাফতগ্রহণে আবু বকর (রাঃ) এর অগ্রগণ্যতার দিকে ইঙ্গিত প্রদান করে। তিঁনি একাদশ হিজরীর **১২** রবিউল আওয়াল মাসের সোমবার দিবসে ফজর ওয়াক্তে আবূ বাকর (রাঃ)-এর ইমামতে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যখন সালাতরত ছিলেন, এমন সময় আয়িশা (রাঃ)-এর ঘরের পর্দা সরালেন এবং দরজা খুলে সালাতরত সাহাবীগণ (রাঃ)-এর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। (হঠাৎ নাবী কারীম (সাঃ) সম্মুখ ভাগে প্রকাশিত হওয়ায়) সালাতরতগণ এতই আনন্দিত হয়েছিলেন যে, সালাতের মধ্যেই একটি পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল (অর্থাৎ নাবী কারীম (সাঃ)-কে তাঁর শারীরিক অবস্থাদি জিজ্ঞাসার জন্য সালাত ভঙ্গ করে দেয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতের ইশারায় সালাত সম্পূর্ণ করে নিতে বলেন। অতঃপর তাদের জন্য মৃদু হাসলেন। সকাল গড়িয়ে যখন চাশতের সময় হল তখন নাবী কারীম (সাঃ) মৃত্যুর কোলে ঢলে

পড়লেন। মৃত্যুকে আশীর্বাদ জানিয়ে বরণ করে নিলেন। তাঁর ওফাত ছিল মুসলমানদের উপর চরম দুর্দশার কারণ, যা তাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরেছিল। মুসলমানরা গভীর উৎকণ্ঠে ও শোকাগ্নিতে উচ্চকিত হয়ে পড়লো। মৃত্যুর পর সাহাবায়ে কেরাম আবু বকর (রা:) এর হাতে হাত রেখে খেলাফতের বায়াত গ্রহণ করেন। সাহাবায়ে কেরাম ইসলামের ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বিতা এবং নবী করিম (সাঃ) এর পর সকল উম্মতের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ জেনে তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করা থেকে কেউ পশ্চাৎমুখী হননি। যাইহোক, রাসূল (সাঃ) কে গোসল এবং তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন করা হলো। অতঃপর তাঁকে তাঁর মৃত্যুস্থলেই দাফন করা হয় তথা আয়েশা (রাঃ) এর গৃহে। পয়গম্বরদেরকে মৃত্যুস্থানেই দাফন করা আল্লাহ তায়ালার একটি চিরায়ত ধারা। জ্বিন ও ইনসান সকলই আমার রবের দরুদ ও শান্তির বারিধারা তার উপর বর্ষণ করুক। আমরা তাঁর যথোচিত আমানত আদায়, উম্মতকে হিতোপদেশ দেওয়া এবং আল্লাহর রাহে যথোপযুক্ত সংগ্রামীতার ব্যপারে সাক্ষ্য প্রদান করছি। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উম্মতের পক্ষ থেকে একজন নবীকে স্বীয় উম্মত কর্তৃক সর্বোত্তম প্রতিদাননুরুপ প্রতিদান দান করুক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা জন্য নিবেদিত হোক।

পরিশিষ্ট ঃ

রাসূল (সাঃ) এর কবি হাসসান বিন সাবেত (রাঃ) বলেন ঃ

১। হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আপনি আমাদেরকে মোদের নবীর সহিত পরশ্রীকাতরদের নয়ন বিদূরিত জান্নাতে একত্রিত করুন।

২। হে মহামহিম, মহান ও সর্বময় প্রভূত্বের অধিকারী তুমি আমাদেরকে একত্রিত করো জান্নাতুল ফেরদৌসে। আর তা আমাদের জন্য নির্ধারিত করে রেখো।

৩। আল্লাহ তায়ালার, তাঁর আরশের চারপাশে বিরাজমান (ফেরেশতাগণের) এবং পুণ্যশীল (আত্মাদের) দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক, বরকতময় অধিক প্রশংসিত সত্তার উপর।

তৃতীয় প্রশ্নপত্র ঃ

প্রশ্নসমূহ ঃ

প্রশ্ন	সত্য/মিথ্যা
১। রাসূল (সা:) এর বকরী চরানো পেশাই তাকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল, দুর্বলদের প্রতি গুরুত্বারোপকারী এবং অনুগ্রহকারী হিসেবে রুপান্তরিত করেছে।	☐ / ☐
২। রাসূল (সা:) এর চল্লিশ বছর পূর্ণকালে তাঁর উপর নবুয়তের প্রদীপ উদ্ভাসিত হয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সোমবার দিন তাঁর রিসালাত প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করলেন।	☐ / ☐
৩। কোরাইশদের রাসূল (সা:) ও তাঁর পরিবারবর্গকে তিন বছর আবু তালেবের গিরি সংকটে অবরুদ্ধ করে অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পেল। এ অবরোধ থেকে রাসূল (সা:) বের হওয়ার সময় তাঁর বয়স উনপঞ্চাশ বছর ছিল।	☐ / ☐

১। রাসূল (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন? মক্কায় ☐ হস্তী যুদ্ধের বছরে ☐ হিজরতের ৫৩ সন পূর্বে ☐ প্রাগুক্ত সবকটিই ☐

২। কিসের মাধ্যমে রাসূল (সাঃ) এর উপর ওহী নাযিল সূচিত হয় : তাঁর নিকট নির্জনতা প্রিয় করা মাধ্যমে ☐ সত্য স্বপ্ন ☐ প্রাগুক্ত সবকটিই ☐

৩। ওহীর স্তর কয়টি : পাঁচটি ☐ সাতটি ☐ তিনটি ☐

৪। রাসূল (সাঃ) এর দাওয়াত ও তাবলীগের স্তর কয়টি? দু'টি ☐ তিনটি ☐ পাঁচটি ☐

৫। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সশরীর ও র˜হ সহকারে বায়তুল মাকৃদিস পর্য˜ড় নৈশভ্রমণ করানো হয়। এবং সাত আসমানের উপর দিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা:) কে স্বশরীর এবং র˜হ সহকারে আল্লাহর নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ তায়ালে তাঁকে সম্মোধন করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেন।

শুধুমাত্র স্বশরীওে ☐ রুহ সহকাওে ☐ স্বশরীর ও রুহ সহকারে ☐

৬। ইসলাম ধর্মের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? মাসজিদুল হারাম ☐ নববী ☐ আক্সস ☐া কুবা ☐

৭। ক্বেবলা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে : হিজরতের পূর্বে মক্কায় ☐ হিজরীর দ্বিতীয় বষ☐´ হিজরীর তৃতীয় বর্ষ ☐

৮। বদর যুদ্ধ কোন বছরের রমযান মাসে সংঘটিত হয়? হিজরীর দ্বিতীয় সনে ☐ হিজরীর তৃতীয় সনে☐

রাসূল (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি :	আলি বিন আবু তালিব	বেলাল বিন রেবাহ	যায়েদ বিন হারিসা	আবু বকর সিদ্দিক	খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ
১। পুরুষদের মাঝে ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
২। নারীদের মাঝে ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৩। শিশুদের মাঝে ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৪। আযাদকৃত গোলামদের মাঝে ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৫। দাস-দাসীদের মাঝে ঃ	☐	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) এর ভরণ-পোষণ	আবু তালিব,	আব্দুল মুত্তালিব ,	প্রায় আট বছর,	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব,	সাত বছর
১। মা আমেনার পর তাঁর পিতামহ দায়ভার গ্রহণ করেন ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
২। পিতামহ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল? ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৩। অতঃপর সহোদর চাচা ভরণপোষণ করেন ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৪। রাসূল (সাঃ) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন কার মৃত্যু হয়? ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৫। বয়স পূর্ণ না হতেই মা মারা গেছেন। (কত)? ঃ	☐	☐	☐	☐	☐

রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সামরিক অভিযানসমূহ		দশ বছর,	ষাট,	সাতাইশ,	নয়টি,	একটি যুদ্ধ
১। রাসূল (সাঃ) এর সমুদয় যুদ্ধ, সামরিক অভিযান ও সারিয়্যা হিজরতের পরবর্তী কত বছর সময়কালের মধ্যেই সংঘটিত হয়?	ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
২। সারিয়্যা ও সামরিক অভিযান প্রায় কতটি?	ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৩। রাসূল (সাঃ) এর যুদ্ধ-বিগ্রহের সংখ্যা?	ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৪। রাসূল তন্মধ্যে কয়টি স্বশরীরে যুদ্ধ করছেন করেছে?	ঃ	☐	☐	☐	☐	☐
৫। কোন যুদ্ধে রাসূল (সাঃ) ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন?	ঃ	☐	☐	☐	☐	☐